Saratchandra : Samtaberer Jiban O Sahitya
—by Tarapada Santra

প্রকাশক :
কেশব জানা
ঋক প্রকাশনী
১৫৪, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

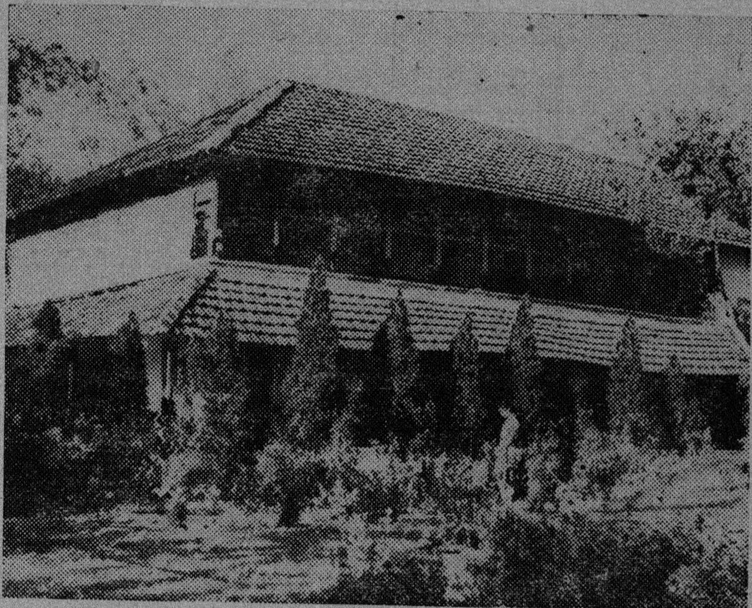
প্রথম সংস্করণ :
৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬ (১৯৫৯ খ্রী:

পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
অজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও বর্ণলিপি :
পূর্ণেন্দু পত্রী

অলঙ্করণ :
তপন কর



শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ী

বিষয়-সূচী :

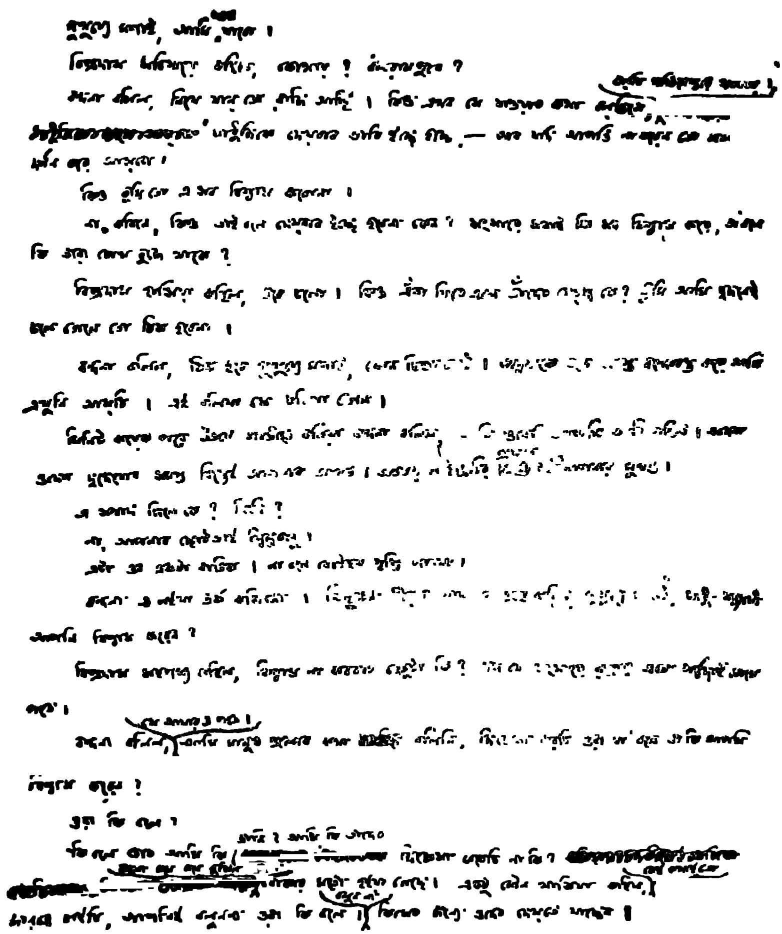
'কিছুই লিখ্‌তে পাবলাম না।

শরৎ

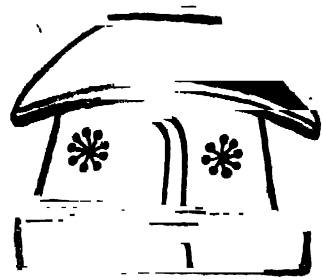
২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

পথের দাবীর দ্বিতীয় ভাগ
আমি যদি সম্পূর্ণ করতে না পারি
আমার দেশের কেউ যেন পাবে
এই কামনা কবি ঃ

'আমার মত কবে তোমাদেব যদি উপন্যাস রচনা করতে হত,
তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখতেই পারতে না।
এমন দিন গেছে, যখন দু-তিনদিন আনাহারে অনিদ্রায থেকেছি।
কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি।
কত বাড়িতে কুকুর লেলিযে দিয়েছে—তারা বডলোক।
কত হাড়ী-বাগদির বাড়িতে আহার কবেছি।
গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি ও তাদেব সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে
তাদেব-মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের
কাহিনী জেনে নিয়েচি।
তারপর খুব ভাল করে দেখে নিযেচি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ।
তাছাড়া আমার উপন্যাসেব অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমাব স্বচক্ষে দেখা।'



'বিপ্রদাস' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি, যা মুদ্রিত পুস্তকে পরিবর্জিত হয়েছে।



শরৎচন্দ্রের পল্লীভবন

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবন ইতিহাসের একটা পাতা।

তার আগে ভূমিকায় বলতে হয়, দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্রের শৈশবের শিশুশয্যা, ভাগলপুর যৌবনের উপবন এবং সামতাবেড় বার্ধক্যের বারাণসী। এই বার্ধক্যের বারাণসীর পটভূমিকায় তাঁর জীবন কাহিনীর পাতা খুলে ধ'রতে চেয়েছি।

হাওড়ার বাজে শিবপুরের বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছেন গ্রামে। গ্রামের জীবন কেমন কাটছে—সেকথা কোন এক শুভাকাঙ্ক্ষীকে লিখে জানাচ্ছেন: '…বেশ আছি। দিনরাত একটা ইজি চেয়ারে ঢাকা বারান্দায় শুয়ে আছি। …তন্দ্রায়, আরামে ক্ষণে ক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপন্ দেখি, জাগি,—চোখ চাইলেই সুমুখে মস্ত নদী, পালের নৌকোগুলোকে গুনি, হঠাৎ কখন চোখ বুঁজে আসে, যায় সব খেই হারিয়ে,—দক্ষিণের সূর্য্যদেবের ঘুরে এসে পড়া রোদে গা দেয় তাতিয়ে, চোখ মেলে গুড়গুড়ির নলটা টেনে দেখি,—বলি, কে আছিস্ রে তামাক দে—হয়ত দিয়েও যায়—কিন্তু টান্‌লে দেখি তেমনই, ধোঁয়া নেই। বক্‌লে বলে, ঘুমুচ্ছিলেন যে। সাজা তামাক পুড়ে গেছে।'

শহর থেকে দূরে হাওড়া জেলার সামতাবেড় গ্রামে (পোঃ পাণিত্রাস, থানা: বাগনান) রূপনারায়ণ নদের তীরে শরৎচন্দ্র একদা নির্মাণ ক'রেছিলেন তাঁর বাসভবন। পল্লীর ভাগ্যহীন মানুষগুলোর সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়ার জন্যেই হয়ত তিনি বাসা বেঁধেছিলেন—এই নিভৃত পল্লীর মধ্যে। পল্লীর ক্লেদাক্ত অসহনীয় জীবনের মধ্যেও তিনি পরম সত্যকে হয়ত আবিষ্কার করার চেষ্টা

ক'রেছিলেন। আর সে জন্যে তাঁর গৌরবেরও সীমা ছিল না। তাই তিনি তাঁর এক প্রদত্ত ভাষণে গর্ব ক'রে বলতে পেরেছিলেন, 'দেশের নব্বই জন যেখানে বাস ক'রে আছেন, সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে, অনেকদিনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে প'ড়েছি, এবং তাদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি।'

এই গভীর বেদনাবোধ ছিল ব'লেই, শরৎচন্দ্র 'ফিরে চলো মাটির পানে'র আহ্বানে অনুপ্রাণিত হ'য়ে একদিন গ্রামের মধ্যে এসে বাসা বাঁধলেন। কিন্তু পিতৃভিটে দেবানন্দপুরে না ফিরে গিয়ে রূপনারায়ণের ধারে কেন তিনি বসতি স্থাপন করলেন—সে প্রশ্ন উঠতে পারে।

রেঙ্গুন থেকে যখন তিনি বাংলায় ফিরে এলেন, তখন উঠেছিলেন বাজে শিবপুরের এক ভাড়া বাড়ীতে। তাই বহুদিন থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল এক স্থায়ী বাসভবন তৈরী করার।

এদিকে দেবানন্দপুরের পিতৃভিটের দখল তখন শরৎচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজনদের কায়েমী স্বত্বে কবলিত। তাই বহুদিন পরে ফিরে আসা দাবীদারের দাবী অচল হ'য়ে গেল। দেবানন্দপুরের এই পিতৃভিটে উদ্ধার করতে না পারার জন্যে শরৎচন্দ্রের দুঃখের অবধি ছিল না। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি পিতৃভিটে উদ্ধার করতে পারিনি বটে, কিন্তু সবাই তো কিছু না কিছু অংশ পায় অথচ আমি ঝাঁটার মতো তুচ্ছ জিনিষও পাইনি। এ দুঃখটা আমার চিরকালের জন্যে মনে জেগে রইলো। একি সহজে ভোলা যায়?'

বাজে শিবপুরে থাকাকালীন দিদি অনিলা দেবীর বাড়ী প্রায়ই যেতেন শরৎচন্দ্র। দিদির বাড়ী হাওড়া জেলার শেষ প্রান্তে রূপনারায়ণ নদের ধারে পাণিত্রাস মৌজার অন্তর্ভুক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে। বর্তমানের সাউথ ইষ্টার্ণ রেলের (পূর্বতন বি. এন. আর.) দেউলটি ষ্টেশনে নেমে সোজা উত্তরে যেতে হয়। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর পড়ে নদীর উঁচু বাঁধ। বাঁধের ওপর উঠলেই দেখা যায় সারি সারি পাল তোলা নৌকো ভেসে চলেছে—হয়ত তারই মধ্যে ভেসে আসছে পল্লীগীতির সুর। নদীর দু'কূল

ছাপিয়ে এঁকে বেঁকে ব'য়ে যাওয়া বিপুল জলরাশি মাঝে মাঝে আছাড় খেয়ে পড়ে নদীর কিনারায়। কখনও বা কাছে পিঠে নৌকোর গায়ে 'ছলাৎ' 'ছলাৎ' শব্দ তোলে।

শরৎচন্দ্রকে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল এই উদ্দাম প্রাকৃতিক পরিবেশ। মাঝে হয়ত তাঁর মনে প'ড়েছিল মাতুল বাড়ী ভাগলপুরে গঙ্গার তীরের ছোটবেলায় ফেলে আসা দিনের সেই সব স্মৃতির ছু'এক টুকরো। সেদিনের সঙ্গে আজকের কত তফাৎ! তবু জীবন দিয়ে আর এক নতুনকে উপলব্ধি করা চলতে পারে—এই ভেবেই জায়গাটা তাঁর বেশ মনে লেগে গেল।[১]

১৯১৯ সাল নাগাদ এগারোশো টাকা দিয়ে গোবিন্দপুর গ্রামের শেষ সীমায় রূপনারায়ণের ধারে জায়গা কেনা হোল বাড়ী করার জন্যে। গোবিন্দপুরের শেষ সীমার দক্ষিণে সামতা গ্রাম, যা ছিল মেল্লক মৌজার অন্তর্ভুক্ত। তখনকার দিনে গৃহস্থেরা তাঁদের ভদ্রাসন, পুকুর-বাগান প্রভৃতিকে সীমানা বরাবর বেষ্টন করে গড় কেটে বা গাছ-গাছালির বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতেন, তাকেই বলা হত বেড়ে বা বেড। সামতা গ্রামের প্রান্তে এই জায়গা কিনে শরৎচন্দ্র তাই নামকরণ করলেন সামতাবেড়। তারপর একসময় বাড়ী করার কাজে নিজের মনোমত ক'রে রূপদান করার কাজ সুরু করলেন। পল্লীর শোভা মাটির বাড়ী। তাই ডাক প'ড়লো গাঁয়ের সেরা মিস্ত্রী গোপাল

দাসের। দেখতে দেখতে পাটির পর পাটি দেওয়াল উঠে ঘর তৈরীর কাজও শেষ হ'য়ে গেল। ঘরের কাঠামো শেষ হ'তে বার্ণপুর থেকে ঘর ছাইবার টালী এলো। ক্রমে মাটির ঘরের উলুটি ও পরে তুষুটি কাজের পর্বও শেষ হ'ল। এই সঙ্গে একতলা ও দোতলার মেঝেও সিমেণ্ট করে দেওয়া হল। বাংলা দেশের চিরাচরিত রীতির আটচালা ধরণের দোতলা বাড়ীটিই হোল অবশেষে তার পল্লীভবন।'[২] এমনি ক'রে একটা দোতলা মাটির বাড়ী, পুকুর ও বাগান প্রভৃতি তৈরীর পিছনে মনোমত ক'রে রূপ দিতে গিয়ে প্রায় ষোল-সতের হাজার টাকা তিনি খরচ ক'রে ফেললেন।

বাড়ী তৈরী চলেছে—ঠিক এমনি সময়ে নীচতা ও হীনতার মধ্য দিয়ে পল্লীসমাজের আসল স্বরূপ উঠলো প্রকাশ হ'য়ে। এতদিন বইয়ের পাতার মধ্যেই তিনি পল্লীসমাজের চেহারাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বাস্তবের কষ্টি পাথর দিয়ে। এবারে সত্যিকারের পল্লীসমাজের সেই নীচতা আর অবিচার একান্তই নগ্ন হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করলো।

তদানীন্তনকালে এই অঞ্চলের গ্রামীন সমাজের সমাজপতিদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। ফলে সমাজপতিদের বহু অবিচার, জবরদস্তি আর তাদের দেওয়া বহু অন্যায় শাস্তিকে মাথা পেতে নিতো গ্রামের মানুষেরা। তাই গ্রামের অধিবাসীদের কাছে এই সব সমাজপতিরা ছিলেন বিশেষ আতঙ্কস্বরূপ।

এদেরই তথাকথিত মৌরসী পাট্টার রাজত্বে শরৎচন্দ্র এসে হাজির হ'লেন। শরৎচন্দ্রের পরিচয় তারা আগেই পেয়েছিলেন। পল্লীসমাজের অবিচার, কুসংস্কার আর সর্বোপরি সমাজপতিদের বিরুদ্ধে কত কি কথাই না এই লেখক লিখেছেন 'পল্লীসমাজ' ও 'পণ্ডিত মশাই'-এর মত বইয়ের পাতায়। বর্তমানে এমন একটি লোক যদি সশরীরে এখানে বসবাস করেন, তাহলে তা হবে সমাজের পক্ষে ঘোরতর দুর্দিন! একে তো তাদের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব হবে, তার ওপর এঁর প্রভাবে প'ড়ে হয়ত দেশের ছেলেমেয়েরা হ'য়ে

---

২ 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে (পৃঃ ১৯০) গোপালচন্দ্র রায় বাড়ীটিকে কেন যে 'বর্মীজ প্যাটার্নের' বাড়ী বলে উল্লেখ করেছেন তা বোঝা গেল না। প্রথাগত স্থাপত্য অনুযায়ী দেশীয় মিস্ত্রীদের তৈরী এমন বাড়ী হাওড়া জেলার বহুস্থানেই আছে।

উঠবে উচ্ছৃঙ্খল। তাই সমাজপতিরা সদলবলে যুক্তি আঁটলেন, কিভাবে শরৎচন্দ্রকে বাধা দিয়ে তার প্রতিপত্তি খর্ব করা যায়।

প্রথম চক্রান্ত হল, তাকে অপদস্থ করার। তাল বুঝে সমাজপতিরা গিয়ে প্রভাবান্বিত করলেন স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মশাইকে। শরৎচন্দ্র এখানে জায়গা কিনে বাড়ী ক'রেছেন, অথচ তিনি তো ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় দেননি বা এ্যাসেসমেন্টের বিরুদ্ধে আপত্তিও জানাননি—তাই অনাদায়ী ট্যাক্সের জন্যে এমন এক বেয়াদপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে একতরফা ক্রোকী পরোয়ানা জারী করা হোক্। কেননা, শরৎচন্দ্র তো এখনও এখানে থাকেন নি। সুতরাং তাঁর অনুপস্থিতিতে ট্যাক্সের বকেয়া আদায়ের জন্যে নবনির্মিত বাড়ীর জানালা-কপাট খুলে যখন নীলাম ডাকা হবে, তখনই তার সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে।

চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র মত কাজ শুরু হোল। ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে ট্যাক্স বাকী পড়ার অজুহাত দেখিয়ে আদালতের ক্রোক পরোয়ানা জারির জন্যে উলুবেড়িয়া সাব-ডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রার্থনা জানালেন।

সৌভাগ্যক্রমে উলুবেড়িয়া সাব-ডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নজরে এলো এই সব ব্যাপার। তিনি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যখ্যাতি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। তাই অহেতুকভাবে শরৎচন্দ্র অপদস্থ হন—তা তিনি চাইলেন না। তিনি শরৎবাবুর বিরুদ্ধে ক্রোকী পরোয়ানা জারীর পূর্বে বিষয়টি অবগতির জন্যে একটি চিঠি পাঠালেন তাঁর কাছে।

শরৎচন্দ্রের বাসভবন তখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং তিনি তখন বাজে-শিবপুরেই আছেন। যথাসময়ে সাব-ডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তিনি ঐ চিঠির উত্তর দিলেন। তিনি লিখলেন :

"Baje-Sibpur,
HOWRAH
12.4.23.

Dear Mr. Dasgupta,

I am in receipt of your letter No. 83, G. of the 11th instant and gratefully appreciate your consideration in

giving me a sort of warning before taking any legal steps in the matter.

I have been building a house in Gobindapur—a village probably under the jurisdiction of Kalyanpur Union Board ; but the house is still under construction, and as no one lives there, I had not had the least suspicion I could have been fixed a rate against an incomplete house or the Board could have suffered me to fall into arrears for so long a time.

However, I have no objection in paying any kind of tax provided it is usual and just, but certainly they should have given me some kind of opportunity at least, either to protest or to pay before going to the extent of Rs…the S. D. O. for the issue of a distress warrant.

But I am not quite surprised. And it fortunate that the Govt. did not leave on these local Presidents to issue warrants themselves.

I am arranging to send Rs (3. 9. 0+3. 1. 0.=6. 10. 0.) to the union within a weak as desired in your letter.

Yours sincerely,
Sarat Chandra Chatterjee."[১]

এই চিঠি থেকেই বোঝা যায় যে, গ্রামে বসবাস করতে আসার জন্যে প্রথম থেকেই তাঁকে কেমন নাজেহাল হ'তে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর বাস্তু সংলগ্ন গোবিন্দপুর মাঠে কিছু ধান জমিও কিনেছিলেন। এই হিসাবে পাণিত্রাস মৌজার এলাকাভুক্ত হওয়ায় তিনি আইনতঃ কল্যাণপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ট্যাক্সদাতা হন। কিন্তু বাস্তু-জমি প্রভৃতি যেরূপ মৌজাভুক্ত

১ পত্রটি শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস) রক্ষিত।

সামতা গ্রামের মধ্যে হওয়ায়, আইনতঃ তিনি মেল্লক ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স-দাতা হন। এক্ষেত্রে কল্যাণপুর ইউনিয়ন বোর্ডের এমন সব অশোভন কার্যকলাপের দরুণ তিনি মেল্লক ইউনিয়ন বোর্ডের 'রেট-পেয়ার' হিসেবে গণ্য হতে চাইলেন। শুধু এই একটি ঘটনাই নয়। স্থানীয় এলাকার সমাজপতিদের হাতে পরবর্তীকালে তিনি এমন বহু তুচ্ছ বিষয়ে যে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন—সে সম্পর্কে বহু ঘটনারই স্বাক্ষর থেকে গেছে এই অঞ্চলে। এই ছিল তখনকার গ্রামীণ সমাজের চেহারা।

তবু শরৎচন্দ্র এই সব ঘটনাকে নগণ্য ব'লে উড়িয়েই দিলেন এবং কোন আমলেই আনলেন না। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ তিনি উঠে এলেন তাঁর এই পল্লীভবনে।[১] রূপনারায়ণের ধারে এই বাড়ীটিকে তখন দেখতে লাগতো ঠিক যেন ছবির মতো। শরৎচন্দ্রও বাড়ীটিকে মনোরম ক'রে তোলার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

গোলাপ, যুঁই আর মল্লিকা ছিল শরৎচন্দ্রের একান্ত প্রিয়। বাড়ীর উঠানে এই সব ফুলের আর সেই সঙ্গে আরও অন্যান্য ফলের চারাও সযত্নে রোপণ ক'রে দিলেন। পুকুর পাড়ে দিলেন ছোট ছোট কলাগাছ লাগিয়ে।

চিত্তরঞ্জন দাসের দেওয়া রাধা-কৃষ্ণের মূর্তিও এ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং পূজার্চনার জন্যে একজন ব্রাহ্মণও নিযুক্ত করলেন।

তাঁর বাসভবনের নীচের তলায় বারান্দার ডানদিকে তারের জাল দিয়ে ঘেরা জায়গায় একজোড়া ময়ূর রাখলেন। এ কালে এই বাড়ীতে ছিলো তার পোষা কুকুর বাঘা ও একটি খাসি—তার নাম স্বামীজি এবং দুটি পাঁঠা—বড়ো মিয়া ও ছোট মিয়া তাদের নাম, আর ছিলো একটা কাকাতুয়া।

বাজে শিবপুরে থাকাকালীনই শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং সামতাবেড়েতে চলে আসায় কংগ্রেস কর্মীরা এখানেই তাঁর সঙ্গে নানান কাজকর্মে যোগাযোগ রাখতেন। অবসর সময়ে সাহিত্য সাধনার মধ্যে নিজেকে একান্ত সমাহিত ক'রে রাখলেন নীচের

১ অত্যন্ত দুঃখের কথা ১৯৬১ সালের 'ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস্ হ্যাণ্ডবুক-হাওড়া'তে সামতাবেড়ের বাড়ী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, 'There is a house where Late Sarat Chandra Chattopadhay lived for tour time' (পৃঃ ৩৬৫)

তলায় নদীর দিকে কাঁচের জানালা দিয়ে ঘেরা একটা ছোট কুঠুরীতে। সেইখানেই তিনি দিনের পর দিন চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর গভীর সাহিত্য সাধনা।

ঘাঁটাল যাওয়ার ষ্টীমার ঘাটে যেতে হলে রাস্তা ছিল শরৎচন্দ্রের বাড়ীর সামনে দিয়ে। সুতরাং পথিকেরা এই পথ দিয়ে যাবার সময় মুগ্ধ বিস্ময়ে এই বাড়ীর দিকে থমকে দাঁড়াতো ক্ষণেকের জন্যে। অচেনারা বাড়ীর মালিকের নাম জানতে চাইতো ; তারপর এই বিখ্যাত লেখকের নাম শুনে তাদের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়তো এক খুশীর আমেজ।

১৯২৬ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র এই গ্রামের বাড়ীতেই কাটিয়ে গেছেন। এখানে থেকেই শেষ জীবনের কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য কতকগুলি প্রবন্ধ-পুস্তকও তিনি রচনা করেন। [পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য] পল্লীভবনটি যে কত প্রিয় ছিল তাঁর কাছে, সে সম্পর্কে তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন, 'পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ী আর রূপনারায়ণ নদ,—এদের মায়া কাটিযে আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে পারি নে।'

কিন্তু যে রূপনারাযণকে এত ভাল বেসেছিলেন—তাও তাকে অস্থির করে দিয়েছে বার বার। বান-বন্যার অত্যাচারে পল্লীর জীবনে নেমে এসেছে ভয়াবহতার অন্ধকার। আর সে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব কিছু হারিয়ে ফেলা মানুষের সঙ্গে তিনি নিজেকেও যুক্ত করে আত্মতৃপ্তি লাভ ক'রেছিলেন একান্ত ভাবেই। বন্যার ভয়াবহতায় দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাননি—বরং এই রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই তিনি পরম লাভ বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

তাই এ পল্লীজীবন ছিল তাঁর কাছে পরম আনন্দের। শেষ জীবনে মৃত্যুর হাতছানিকে বোধ হয় তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই কোলকাতায় চিকিৎসার জন্যে শেষ বারের মত তিনি ছেড়ে চললেন তাঁর এই প্রিয় বাসভবন ; যেখানে তিনি মারী-মড়ক, দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ, অবিচার-ঘৃণা এবং স্নেহমমতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন।

তাঁর মাতুল স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণনা দিয়েছেন সেই বিদায় লগ্নের ; লিখেছেন : 'তখন রূপনারায়ণের জোয়ার আসছে। এগিয়ে গিয়ে

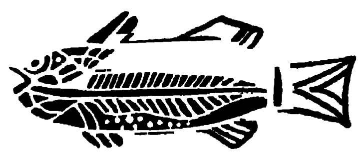
দুজনে দেখতে লাগলাম—উদ্বেল জলরাশির অধীর উচ্ছ্বাস। অধীর শুধু নয়, উদ্দামতাও আছে তার।

এই বাড়ীটা—শরৎ বোললেন, আমায় যে কি মর্মান্তিক আকর্ষণে টানে! যেন আমাকে পেয়ে বসেছে!

বোললাম, সেই রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের মতই, তফাৎ যাও—তফাৎ যাও—সব ঝুট হ্যায়—

শরৎচন্দ্রের চোখ দুটি বাষ্পকরুণ হ'য়ে যেন অশ্রুবর্ষণ করে আর কি !'

সেই তাঁর শেষ যাওয়া! আর তিনি ফিরে আসতে পারেননি তাঁর এই প্রিয় পল্লীভবনে।



শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন

গ্রামের মানুষদের প্রতি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে একদা জলধর সেন তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন : 'শরৎ অতি মলিন মুখে বললেন,—দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার চারপাশের গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের যে কি দুর্দশা ! তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই, সে যে কি—শরৎ আর বলতে পারল না ; তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।' বলতে গেলে এই দরদী মন নিয়েই শরৎচন্দ্র এসেছিলেন সামতাবেড়েতে। তাই পল্লীগ্রামে বাস ক'রে পল্লীজীবনের সঙ্গে একদিকে তিনি যেমন নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ আর ব্যথা-বেদনাকে তিনি একান্তই আপন ক'রে নিতে পেরেছিলেন। সেজন্যে হতভাগ্য পল্লীবাসীর দুঃখ দৈন্যকেই তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যের মধ্যে তুলে ধরেননি, এই সব বঞ্চিত ও হতভাগ্যদের প্রাত্যহিক জীবনের মাঝেও তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

রোগ মহামারী আর দুর্ভিক্ষকে আশ্রয় ক'রেই পল্লীর মানুষের জীবনযাত্রা। অসহায় দরিদ্র পল্লীবাসীদের এই দুঃসহ ব্যথা বেদনা শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত করে তুলেছিল একান্তই। তাই সময়ে অসময়ে এই সব ভাগ্যহীন পল্লীবাসীদের ওষুধ আর পথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এটি ছিল একটি বড় কাজ।

বর্ষাকালে পল্লীর রাস্তাঘাটের অবস্থা সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। এ সম্পর্কে তিনি শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে চিঠিতে লিখেছেন—'যে বিশ্রী পথ, তাই কেউ আসবে বললে ভাবনা হয়—এ রাস্তা পার হবে কি করে? তাছাড়া

এখনকার তো কথাই নেই, কাদা এক হাঁটু পর্যন্ত না উঠলো তো আর পাড়াগাঁয়ের মর্যাদা রইলো কোথায় ?'

পল্লীর রাস্তাঘাটের এই চরম অব্যবস্থা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র কৌতুক করে লিখেছেন কোন এক চিঠিতে, 'আচ্ছা জায়গাতেই এসে পড়েছি। এখানকার লোকের একটা সুবিধে আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে খুর গজায়— তাতেই দিব্যি খট-খট ক'রে হেঁটে চলে,—পিছলকে ভয় করে না। আমার এখনো ওটা গজায়নি—তবে এঁরা ভরসা দিয়েছে আরও দু-এক বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে।'

এ গেল পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাট সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা। এবারে আর এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। তা হোল বান-বন্যার মত ভয়াবহ পরিস্থিতি। বর্ষায় রূপনারায়ণে যখন দুকূল ছাপিয়ে বান ডেকে আসে—তখন গ্রামের মানুষের মধ্যে এক বিভীষিকাময় সাড়া পড়ে যায়। সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হ'য়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। তারপরে এই বান-বন্যার অত্যাচারে পল্লীর মানুষেরা সম্বলহারা হ'য়ে পড়ে। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে শোক আর দুঃখের অন্ধকার।

শরৎচন্দ্র এদের এই জীবনের মধ্যে থেকেই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন নদীর বান-বন্যার বিভীষিকাময় অত্যাচার। তাই তিনি কোন এক চিঠিতে লিখেছেন : 'বান ও বন্যায় ঐ নদী (রূপনারায়ণ) যে কি ভীষণ হ'তে পারে এবারে ভাল ক'রে দেখলাম। যে নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে তোমরা আমাদের এখানে আসতে সে নেই। বোধহয় আজকের জোয়ারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপরে জল আর জল ! বাংলাদেশের ষড় ঋতুর অর্থ যে সত্য-সত্যই কি বস্তু তা এখানে বছরখানেক না থাকলে বোধ করি জানাই যায় না। এও একটা পরম লাভ।...দিন দশ-পনেরো বান আর জোয়ার, এখানে মাটি দেওয়া আর ওখানে বোজানো এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে।'

শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবনের এ গেল এক দিক। কিন্তু এই পল্লীজীবনে নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে তিনি যেমন শান্তিতে দিন কাটাতে পারেন নি, তেমনি তাঁর পল্লীজীবনের আর একদিক কেটেছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর রেষারেষির মধ্যে। তদানীন্তনকালে এই অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজের সমাজপতিদের ছিলো

দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাদের শোষণ, অত্যাচার আর অবিচারের ফলে গ্রামের মানুষের জীবন কাটতো দুঃসহভাবে। এদের এই নীচতা আর অবিচারের কথা শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখা 'পল্লীসমাজে।' সুতরাং এইসব বই পড়ে বা খোদ লেখকের এই পল্লীতে বসবাসের ফলে গ্রাম্য সমাজপতিদের একচেটিয়া প্রতাপ হয়ত খর্ব হয়ে যেতে পারে—এই জন্যে সমাজপতিরা শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রথমেই যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

এখন শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী, তাঁর নাকি বিবাহ করা স্ত্রী নয়—এই মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে গ্রামের সমাজের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে 'একঘরে' করা হোল। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি হোল, 'শরৎচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার কৃষ্ণদাস অধিকারীর কন্যা হিরন্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের সময় শরৎচন্দ্র আত্মীয়স্বজনদের না জানানোয় অনেকেই তাঁর এই বিয়ের কথা আদৌ জানতেন না। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন কেউ কেউ হিরন্ময়ী দেবী কোথাকার, কি জাতের মেয়ে এই নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা করতো। শরৎচন্দ্রের একটা স্বভাব ছিলো যে, তিনি মিথ্যের কখনও প্রতিবাদ করতেন না। বরং কিছু না বলে মজা উপভোগ করতেন। শরৎচন্দ্রের এই স্বভাবের সুযোগ নিয়ে, যারা তাঁর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করত তারা শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে 'একঘরে' করেছিল।'[১]

তাঁর এই একঘরে হওয়া সম্পর্কে সে সময়ে তিনি তাঁর পুস্তকের প্রকাশক হরিদাসবাবুকে তাঁর ভাগ্নীর বিয়েতে টাকার প্রয়োজনের তাগিদে এক পত্রে লিখেছেন, 'এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে'। আমার কাজকর্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। যাক সেজন্যেও ভাবিনি কিন্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ আমি না যাই, এই তাদের গোপন ইচ্ছা।'

যে শরৎচন্দ্র তাঁর লেখনীর মধ্যে পল্লীসমাজের এই বঞ্চনা আর অবিচারের কথা তুলে ধরেছিলেন, বাস্তব জীবনেও যে তিনি এই সব তথাকথিত সমাজপতিদের হাতে নিগৃহীত হবেন—তা কে জানতো? তবু তিনি এ-ব্যাপারে স্থির রইলেন এবং এ-বিষয়টিকে তিনি কোন আমল দিলেন না।

১ গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃ-১৫৭

কিন্তু সমাজপতিরা শরৎচন্দ্রকে আরও কিভাবে জব্দ করা যায়—তার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হলেন। এ অঞ্চলে তখন বলদের পিঠে ধানচাল বোঝাই ক'রে যারা বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করতেন, তারাও একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীর পথে যেতে বাধা পেলেন। শরৎচন্দ্রকে 'একঘরে' করার অজুহাতে পথরোধ করা হল সমাজপতিদের পক্ষ থেকে। এ ঘটনার কথা সামতাবেড়ের কাছাকাছি বকুন্দা গ্রামের জনৈক বৃদ্ধের কাছ থেকে শোনা গেছে। এমনি ভাবে বেশ কিছুদিন শরৎচন্দ্রের উপর চললো একঘরের অজুহাতে তার উপর অত্যাচার।

অবশেষে স্থানীয় এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শরৎচন্দ্রকে সমাজপতিরা নিমন্ত্রণ করেন এই উদ্দেশ্যে যে, শরৎচন্দ্র বা তাঁর পরিবারবর্গ নিমন্ত্রণ বাড়ীতে এলে তাঁদের যথাবিহিত অপমান করা হবে, আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না এলে—সমাজের অপমান হ'যেছে বলে বিরুদ্ধে বলার এক ক্ষেত্র তৈরী করতে পারা যাবে। কিন্তু ঐ অনুষ্ঠান পর্বে শরৎচন্দ্রের সহধর্মিণী হিরন্ময়ী দেবী উপস্থিত হ'য়েছিলেন এবং তাঁকে সে সময় পরিকল্পনা মাফিক অপমান করার সাহস কারুরই হয়নি। সমাজপতিদের এই ভীরুতা প্রকাশ হবার পর শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে 'একঘরে'র অনুশাসন ধীরে ধীরে ভেঙ্গে প'ড়েছিল।

পরবর্তী সময়ে সমাজপতিদের এই 'একঘরে' আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছিল এবং একদিন যাঁরা শরৎচন্দ্রকে একঘরে করার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তারাই পরে জনসমর্থন হারিয়ে শেষ পর্যন্ত 'একঘরে' হয়ে গিয়েছিলেন।

অবশেষে এ দ্বন্দ্ব আর রেষারেষির শেষ হলো। এরপর আর এক জটিল সমস্যার মুখোমুখি হ'লেন তিনি। এবারে এক ক্ষুদে জমিদারের সঙ্গে তাঁর বাধলো তীব্র বিরোধ। গ্রামে থাকাকালীন এই ঘটনাটিই শরৎচন্দ্রকে খুবই বিচলিত ক'রে তুলেছিল। এ সম্পর্কে তিনি এক চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে জানিয়েছিলেন, 'পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ মামলায় জড়িয়ে সিভিল এবং ক্রিমিন্যাল,—বেশ উত্তেজনায় ছুটোছুটি সুরু করেচি। এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে দিব্যি ছিলাম, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেব্‌তার আর সইল না, ঘাড়ে চাপ্‌লেন। বড় জমিদারের কাছে পার আছে, কিন্তু স্থানীয় অতিক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ

দুর্বিষহ। ২।৪ বিঘা ছিল বহুকালের শিবোত্তর—জমিদারের দান, কিন্তু ২।৪ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো, —লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে, আমি হাতে নিলে তা ছাড়িনে। তারপরে ফৌজদারী। যাক্ সে কথা, তবে ঝঞ্ঝাট বেড়েছে।'

এই যে ঘটনাটি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল—তার সূত্রপাত হ'লো স্থানীয় একটা শিবোত্তর জায়গা নিয়ে। পূর্বের জমিদারের দেওয়া বহুকালের এই শিবোত্তর জায়গা ও তৎ-সংলগ্ন একটা নীচু জমি নিয়ে বিবাদ বাধলো স্থানীয় এক পত্তনীদার জমিদারের সঙ্গে। পত্তনীদার জমিদারটি শিবোত্তর জায়গাটি নিজের দখলে ব'লে ঘোষণা ক'রে গ্রামবাসীদের বঞ্চিত করতে চাইলেন এবং দখল কায়েম প্রমাণের জন্যে ঐ জায়গায় জনৈক 'বাগ' পদবীধারী মৎস্যজীবীকে জলকর বিলি করে দিলেন।

এর ফলে গ্রামবাসীরা গেল দারুণ ক্ষেপে। বহুদিন ধরে এই সব জমিদারী শাসন ও অবিচারের ফলে প্রজাদের মনেও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। অতএব পত্তনীদারের কাছ থেকে বিলি নেওয়া জলকরভোগী সেই মৎসজীবীটির অস্থায়ী কুঁড়েটিকে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গ্রামবাসীরা ভেঙ্গে দিলো। গ্রামের জমিদাররা তখন ছিলেন বৃটিশ শাসনের অনুগত প্রজা। তাই, তাদের সাহায্যের জন্যে থাকতো দেশের থানা, পুলিশ আর চৌকিদার। ফলে এই ব্যাপারটি অনেকদূর পর্যন্ত গড়ালো। কুঁড়ে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে থানা-পুলিশ করলেন জমিদার বাবু। বহু নিরপরাধ গ্রামবাসীর কোমরে পড়লো দড়ি আর সেই সঙ্গে বহু লোকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হোল। গোটা গ্রাম জুড়ে এক বিভীষিকাময় পুলিশী সন্ত্রাসের রাজত্ব সুরু হোল।

গ্রামের মধ্যে পুলিশ আর জমিদারের যৌথ অত্যাচারের ফলে গ্রামবাসীরা নিজেদের খুবই অসহায় বোধ করেন। তাই এদের এই অন্যায় অত্যাচার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁরা সমবেতভাবে শরৎচন্দ্রের দ্বারস্থ হলেন।

শরৎচন্দ্র আগেই এই ঘটনায় খুব বিচলিত হয়েছিলেন এবং সমবেত গ্রামবাসীর আহ্বানে তিনি তাদের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন। গ্রামবাসীদের এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে সে সময়ে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করলেন এবং এই পুলিশী অত্যাচার প্রতিবিধানের জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন।

এই ঘটনা নিয়ে তিনি তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন, 'স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র জমিদারের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাতে গিয়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলাতেই জড়িয়ে গেছি। ঠিক আসামী হই নি বটে, কিন্তু দিদির এক দেবরকে মুল আসামী করার জন্যে আমার অশান্তিও কম হয় নি। লেখা-পড়া দুই-ই ঘোচবার যো হয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের দাবীই জয়যুক্ত হয়েছিল। জমিদারপক্ষ শিবোত্তর জায়গাটি গ্রামবাসীদের ফিরিয়ে দিয়ে একটা আপোষ-মীমাংসা ক'রে নিতে বাধ্য হ'য়েছিল।

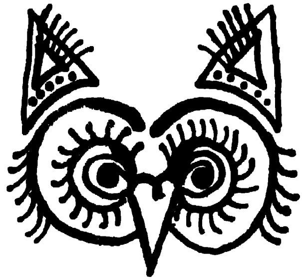
গ্রাম্য দলাদলির আর এক উদাহরণ দিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন যে, সমাজপতিরা একবার শরৎচন্দ্রকে জব্দ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বাঁধ কাটিয়ে জোযারের জল ঢুকিয়ে ফসল নষ্ট করার অভিযোগ এনেছিলেন (পৃঃ ২২৪)। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই বাঁধ কাটানোর জন্যে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হযনি। শরৎবাবুর ভগ্নীপতি পঞ্চাননবাবুর ভাই পাঁচকড়িবাবুর বিরুদ্ধে বাঁধ কাটানোর অভিযোগে যে মামলার উদ্ভব হয় তাতে শরৎচন্দ্র ঐ মামলার তদ্বির করেছিলেন এবং সেজন্যে উকিল বরদাবাবুকে জবাবের একটা খসড়াও তৈরী করে দিয়েছিলেন। বাঁধ কাটানোর প্রকৃত ঘটনা হল, মেল্লক খালের মুখে তখন স্লুইস বসেনি। সেবার গ্রামবাসীদের অনুরোধে মাঠে জোয়ারের জল তুলে চাষাবাদের জন্য পাঁচকড়িবাবু সরকারের সেচ বিভাগের কাছে তদ্বির করে মুচিপাড়ার কাছে বাঁধ কাটাবার হুকুম পেয়েছিলেন ; তবে 'রেজিষ্টার্ড এগ্রিমেণ্ট' অনুযায়ী কথা ছিল প্রতি বছর ঐ হানা বন্ধ করে দিতে হবে। কয়েক বৎসর এইভাবেই চুক্তিমত কাজ হচ্ছিল। কিন্তু সে বছর ঐ কাটানো বাঁধ ভরাট করার জন্যে গ্রামবাসীরা তেমন উদ্যোগ না দেখানোর ফলে, বর্ষার সময় হঠাৎ বন্যা দেখা দেওয়ায় বহুস্থানে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয় এবং এর ফলে পাঁচকড়িবাবুর বিরুদ্ধে বাঁধ কাটানোর অভিযোগ আনা হয়। অবশ্য বিষয়টি বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। পরে শরৎবাবুর হস্তক্ষেপে সালিশ-মীমাংসায় এটির নিষ্পত্তি হয়।

এই ছিল তখনকার গ্রামীণ সমাজের চেহারা। অবিচার, বিবাদ-বিসম্বাদ

আর দলাদলির বিষে ভরা থাকতো এই পল্লীসমাজ। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জয়লাভ ক'রে পল্লীর বুকে মুষ্টিমেয় জনাকয়েক চালাতো তাদের শাসন আর শোষণ এবং অবশিষ্ট ভাগ্যহীনদের জীবন কাটতো এক ক্লেদাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে। তাই দুঃখ ক'রে শরৎচন্দ্র কোন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এই পাড়াগাঁয়ের সমাজ।
যাকে শহর থেকে মনে করেছি—সেখানে পদ্ম ফুটেছে, মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেমে গলাগলি করছে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাচ্ছে এই সব, সেখানেও পুকুরে শালুক ফুটছে, বিলাতী কচুরীতে সব ছেয়ে গেছে; দলাদলির তো অন্ত নেই।'

তবুও পল্লীগ্রামের এই অন্ধ-কুসংস্কার আর স্বেচ্ছাচারের মধ্যে বাস করেও তিনি তাঁর পল্লীজীবনকে সার্থক বলে মনে করেছেন। ক্ষোভ আর দুঃখের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সেই পরম সত্য—গ্রামের মানুষের দুঃসহ জীবন-কাহিনী। তাঁর মত একজন দরদী সাহিত্যিক তথা দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি তাই লিখতে পেরেছিলেন, 'নিজের দেশটিকে আমি বাস্তবিক ভালবেসেছি। ইহার জল-বায়ু, ইহার দোষ-গুণ, ত্রুটি-দলাদলি বা যা কিছু বল, বাস্তবিকই আমি ভালবেসেছি। নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। মানুষকে তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিষ বাহির হয়, তখন তাহার দোষ-ত্রুটিতে সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না।'

দরদী শরৎচন্দ্র ছাড়া একথা এমন গর্ব ক'রে আর কে বলতে পারে?



পল্লী দরদী শরৎচন্দ্র

ভাগ্যহীন মানুষের ওপর শরৎচন্দ্রের দরদ ছিলো অপরিসীম। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে মানুষ আত্মাবমাননায় ক্ষত-বিক্ষত, জীবনকে সুন্দর ক'রে তোলার সমস্ত উপচার থেকেও যারা পদে পদে কুড়িয়ে বেড়ায় লাঞ্ছনা আর উপহাস, তাদের মাঝেই শরৎচন্দ্র ঠাঁই খুঁজেছেন। তাদেরই অব্যক্ত বেদনাকে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাই দরদ দিয়ে লিখতে পেরেছিলেন: 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই···এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।'

শুধু সাহিত্যের মধ্যেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেননি। বাস্তব জীবনেও তিনি এগিয়ে এসেছেন এই সব সর্বহারা মানুষদের একান্ত সান্নিধ্যে। শহর থেকে দূরে হাওড়া জেলার শেষ প্রান্ত সামতাবেড়ের মত পল্লীগ্রামে বাস ক'রে পল্লী-জীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠভাবেই। অবহেলিত গ্রামের দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও মহামারীতে আক্রান্ত মানুষকে ভয়াবহতার হাত থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন বার বার। এই সব রোগাক্রান্ত মানুষেরা সব চেয়ে বঞ্চিত হয় চিকিৎসা আর পথ্যের সুবন্দোবস্ত থেকে। তাই এই দরিদ্র দেশের চিকিৎসার জন্যে তিনি হোমিওপ্যাথী ওষুধ বিলি করতেন। প্রয়োজনমত নিজের পয়সা দিয়ে তাদের পথ্যেরও বন্দোবস্ত করে দিতেন।

সেই সঙ্গে এই রোগাক্রান্ত মানুষের সেবা-শুশ্রূষা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

পল্লীর এই সব অবহেলিত মানুষের প্রতি তাঁর দরদের সীমা ছিল না। একবার এক চিঠিতে তিনি এদের অসহায়ত্বের কথা দুঃখ ক'রে লিখে জানিয়েছেন, 'দিদির শাশুড়ীর কাজকর্ম খুব ঘটা-পটা করিয়া সারা হইল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাদের দেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বড্ড বেশি, গরীব দুঃখীরা মরচেও মন্দ না। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম, নিজে গোটা দুই মাত্র মারিতে পারিয়াছি,—আর কিছুদিন থাকিতে পারিলে আরও কোন্ না গোটা দুই তিন শিকার মিলত! দুর্ভাগ্য,—কাবু হইযা পড়িলাম। (ওষুধ ও বিশেষ করিয়া পথ্যের অভাবেই,—তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় মিলিতেছে।) তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জ্বরটাই বেশ সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। আজকের দিনটা কোনমতে চাপা আছে। আর এমনি চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব।'

এই দরদী সাহিত্যিকের প্রাণ! পল্লীর এই রোগাক্রান্ত দুর্ভাগাদের প্রতি তদানীন্তন অর্থশালী লোকেদের কোন আগ্রহই ছিল না। তাই শরৎচন্দ্র ইচ্ছে করলেই এই সব অবহেলিতদের ছেড়ে থাকতে পারতেন নাসিকা কুঞ্চন ক'রে। তারপর তাঁর সাহিত্যে এদের সম্পর্কে তিনি কপট সমবেদনা জানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি বাস্তবে তা করেন নি। পল্লীর এই সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ব'লেই বাস্তব জীবনে তিনি এদের দুঃখ মোচনের জন্যে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্রের দরদীমনের এমন বহু ঘটনাই ছড়িয়ে আছে। শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় সামতাবেড়েতে বাড়ী তৈরী সুরু করেন, তখন ইংরেজী ১৯২৩ সাল। ঠিক এই বৎসরে গোবিন্দপুর গ্রামে কলেরার মহামারী এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে, শুধুমাত্র ঐ অঞ্চলেই ১৬২ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়। সেই সঙ্গে মারা পড়ে প্রায় পঞ্চান্ন জন। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে এক বিভীষিকার রাজত্ব চলতে থাকে। গ্রাম ছেড়ে মানুষেরা চ'লে যেতে থাকে অন্যত্র। শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চাননবাবুর পরিবারবর্গের সকলেই এ সময়ে

শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে গ্রামের রোগাক্রান্তদের পরিচর্যার কাজে এগিয়ে আসেন। সম্ভবমত ওষুধ ও পথ্য সরবরাহ করেন নিজ ব্যয়ে। এইসঙ্গে স্থানীয় ডাক্তার রমেশবাবু, গোবিন্দপুরের পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিম ঘোষালও আক্রান্ত রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ওষুধ ও পথ্য সরবরাহের সঙ্গে, একটি বড় চুল্লীতে বসানো গরম জলের ডেকচিতে রোগীদের ব্যবহৃত থালা-বাসন এবং কাপড়-চোপড় ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই নিদারুণ ভয়াবহতার মাঝে শরৎচন্দ্রের সেই স্থির ও অচঞ্চল মূর্তি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হ'যে উঠে।

অথচ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যখ্যাতি তখন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তাই সাহিত্যিক পদমর্যাদায় তিনি নিজেকে বিলাস-ব্যসনে ও সুখনিদ্রার মধ্যে এলিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বঞ্চিত মানুষদের এই অসহায়তার মধ্যে সেবা-শুশ্রূষা করাটাকেই জীবনের একটা বড় কাজ বলে গণ্য ক'রেছিলেন। কতখানি গভীর জীবনবোধ থাকলে তিনি নেমে আসতে পারেন এই সব ভাগ্যহীনদের মাঝে—তা এ থেকেই বোঝা যায়।

এ ছাড়া, এই সময় এ অঞ্চলে বেশ দুর্ভিক্ষ হয়। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব এবং সবশেষে কাজ পাওয়ার সমস্যা তীব্রতর হ'য়ে উঠে গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে। ঠিক এমন সময়ে তিনি সামতাবেড়েতে (পোঃ পাণিত্রাস) বাসভবন নির্মাণের এবং পুষ্করিণী খননের কাজে হাত দিয়েছিলেন। এর ফলে দেশের শ্রমজীবী মানুষেরা তখনকার মত কাজ পেয়ে বেঁচেছিল বলেই শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না।

দুঃস্থ লোকের প্রতি শরৎচন্দ্রের কি মমতা ছিল, সে সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রেছেন অবিনাশ ঘোষাল তাঁর 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, 'এমনি সময়ে গ্রামের এমন একটি লোক এল, যার দেহের চামড়া ছাড়া মাংস বলে যে কিছু আছে, তা আমার চোখে পড়ল না—অস্থি চর্মসার দেহ বলতে যা বোঝায়, সে যেন তার প্রতিমূর্তি। তাকে দেখেই শরৎচন্দ্র বললেন, আজ তুমি যাও, কাল তোমার ব্যবস্থা আমি করে দেব। তাই শুনে লোকটি চলে গেল বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের এতক্ষণের সমস্ত উদ্দীপনাকে সে

যেন ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে গেল। আকস্মিক বিষণ্ণতায় তাঁর মুখখানা এমনি ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো যে, আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলুম না। বললেন, এদের ফেলে আর আমার কোলকাতায় যেতে ইচ্ছে হয় না। এরা যে কি রকম গরীব, তা তোমরা শহর থেকে কিছুতেই ধারণা করতে পারবে না। আর কি জান, দুঃখ জিনিসটা এমনি যে, জীবন দিয়ে তাকে উপলব্ধি না করলে, কোনদিন তার সত্য রূপটা ধরা পড়ে না। এদের দেখলে আমার নিজের গোড়ার জীবনটা যেন ছবির মত আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।'

গ্রামে থাকাকালীন তাঁর আরও কতকগুলি মহৎ গুণ দেখা গেছে। গভীর রাত্রিতে রোগাক্রান্ত কোন পল্লীবাসীর ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারতেন না। বেরিয়ে পড়তেন হোমিওপ্যাথী ওষুধের বাক্স সঙ্গে নিয়ে। তাদের যথাসাধ্য ওষুধপত্র দিয়ে সুস্থ ক'রে তুলতেন। তাই এই অঞ্চলের নীচুতলার মানুষদের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু—সুখ-দুঃখের সাথী। এদের স্নেহ দিয়ে, সেবা দিয়ে তিনি ভালবাসতে পেরেছিলেন একান্তই। তাই তিনি এসব মানুষদের কাছেও বাস্তব জীবনে একজন দরদী হ'তে পেরেছিলেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন, 'আমায় যে লোকে ভালবাস্‌ল তার প্রধান কারণই হচ্ছে এই, লোকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার কথাগুলো মেলে। মানুষ সত্যি ছোট নয়, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার দরুণ অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম। যেটা বাইরে থেকে জানা যায় না।'

এখানেই ছিল অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। তাই তো শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে নিপীড়িত ও অধঃপতিতদের জীবনের কাহিনীকে এত মর্মস্পর্শীভাবে পরিবেশিত করতে পেরেছিলেন।

রোগ মহামারী ছাড়াও, এদিকে পল্লীর বান-বন্যা ছিল চিরন্তনী নিয়ম। এই সর্বগ্রাসী বন্যায় কত মানুষই যে সম্বলহারা হয়ে পড়তো—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। শরৎচন্দ্র এইসব বন্যার্তদের মাঝেও তাঁর মহৎগুণের পরিচয় রেখে গেছেন। সামান্য একটি চিঠির ঘটনা থেকে বোঝা যাবে—তিনি এদের কতখানি দরদ দিয়ে ভালবাসতেন। কোন এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'এইমাত্র একজন নৌকোর মাঝির চিকিৎসা ক'রে এলাম। সর্বাঙ্গে Tincture Iodine মাখিয়ে Arnica খাবার ব্যবস্থা ক'রে, তাপ সেকের বন্দোবস্ত ক'রে

দিয়ে ফিরেছি। কাল রাত্রে তার নৌকা ডুবে, তার ওপর দিয়ে নৌকা ভেসে গিয়েছিল।'

শুধু বন্যার্তদের সেবাই নয়, বন্যা রোধের জন্যেও তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিলো না। বন্যার ফলে নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য তিনি আর পাঁচজনের মত একেবারে উদাসীন থাকতে পারেননি। একাজে নিজ ব্যয়ে বহুশত টাকার বাঁশ কিনে দিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের—বাঁশের পিন পুঁতে ভাঙ্গন রোধ করার জন্যে। সুতরাং এ সবের মধ্যেও ফুটে উঠেছে শরৎচন্দ্রের সেই দরদী সত্বার পরিচয়।

পল্লীসমাজের হিংস্র কশাঘাতে যারা আহত ও রক্তাক্ত, তাদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দরদ ছিলো প্রাণ-ভরা। এই কারণে গ্রামীন সমাজে মেয়েদের দুর্গতি তাঁকে যে শুধু বিচলিত ক'রেছিলো তা নয়, তাঁকে বিদ্রোহী করেও তুলেছিল। যে তথাকথিত সমাজ নারীজাতিকে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রেছে, অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কোন এক চিঠিতে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর এই বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয়। তিনি লিখেছেন, 'দিদি, তোমাদের সম্বন্ধে কোন সমাজই কখনই সুবিচার করেনি, আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবনভোর তারই প্রতিবাদ করবো।'

সমাজে ধিক্কৃত হয়েছে যারা, তাদের মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য সকলের সামনে ধ'রে দেওয়াতেই সমাজের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহের চরম প্রকাশ। তাই বাস্তবজীবনে শরৎচন্দ্র কোনদিন নারীর প্রতি অসম্মান ও অবহেলা দেখাননি। সামতাবেড়ে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কাছেও শুনেছি যে, নারীকে তিনি কত সম্মান করতেন! তাঁর লেখার মধ্যেও নারী-সমাজের প্রতি যে দরদ ও আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিলো, বাস্তবক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সেই একই ধাতে গড়া মানুষ। দরিদ্র স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর দয়া ছিল অসীম। এদের তিনি গোপনে গোপনে অনেক সাহায্য করতেন।

সামতাবেড়ের শরৎচন্দ্রের জীবন দর্শনের বেশীর ভাগটাই হল এইসব নিপীড়িতদের সেবা করা। সাহিত্যিক মনোজ বসু তাঁর লেখায় শরৎচন্দ্রের এই দিকটি তুলে ধরেছেন—তাঁর চোখে দেখা ঘটনার বিবরণ দিয়ে। তিনি

লিখেছেন, 'সামতাবেড়ের পল্লীবাসে শরৎচন্দ্রকে দু একবার দেখেছি।...মনে পড়ে সেটা শীতকাল। উঠান ও বারান্দা ভরে গেছে গ্রামের নানা বয়সী স্ত্রী পুরুষের, সকলের মাঝখানে ইজিচেয়ারে বসে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র।

..সুদূর গ্রামপ্রান্তে দাদাঠাকুরের গোপন কীর্তি অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল। শুধু পয়সা দিয়ে দায় সারা নয়; ঘর-গৃহস্থালীর সকল খবর নিয়ে তবে এক একজনের ছুটি। একজনকে বললেন—তোর মেয়ে কেমন আছে রে ছবির মা?

—ভাল আছে দাদাঠাকুর, ওষুধ তোমার ধন্বন্তরী।

—কিন্তু ছেলেটাকে তোরা এমন অসাবধানে ফেলে দিলি! ভেসে ভেসে শেষে ঐ চড়ায় এসে আটকাল। কাকে শকুনে ভীড় করে এসেছে—দেখে থাকতে পারলাম না। তুলে আবার মাঝ নদীতে ফেলে দিয়ে এলাম।[১] বামুনকে দিয়ে শেষটা মড়া ফেলিয়ে ছাড়লি, হাঁরে ছবির মা?

বুড়ি ছবির মা আঁচলে চোখ ঢাকল। সেদিন সন্ধ্যায় ..সকাল বেলাকার সেই ছবি মেয়েটার প্রসঙ্গ উঠল। মেয়েটি কুলীন জাতের নয়। বছর আষ্টেক বয়সে বিয়ে হয়। পতিটি পিতামহকল্প—অন্তত বয়সের দিক দিয়ে—সত্বর পরমাগতি লাভ করলেন। রইল মেয়েটা আর তার অটুট-স্বাস্থ্য। সম্প্রতি ঘরের চাল কেটে মেয়ে ও মাকে পাড়ার মধ্যে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; তারা নাকি কোন কোন সমাজমনির বংশদুলালকে খারাপ করছে। বংশ-দুলালেরা যে পাড়ার বাইরের পথ না চেনেন এমন নয়। বিপন্ন মা-মেয়ের দিন কাটছিলো দাদাঠাকুরের দয়ায়। মেয়েটির অনেক দুঃখের ধন একটি ছেলে—সেটিও আগের দিন মারা গেছে।'

সমাজের হিংস্র কশাঘাতে যারা আহত ও রক্তাক্ত তাদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দরদ ছিলো প্রাণভরা আর তাদের জীবনের কাহিনীকেই তিনি যে তার লেখনীর উপজীব্য করে তুলেছেন, তারই স্বীকারোক্তি করেছেন এই বলে, 'কোলাঘাট ষ্টেশনে একটি স্ত্রীলোক পান বেচত। সচরাচর যে রকম স্ত্রীলোক এ রকম ভাবে পান বেচে, তাকে দেখলে তা মনে হোতো না। এই কারণে তার প্রতি আমার একটা ঔৎসুক্য জাগে। তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়;

১ শরৎচন্দ্রের ভৃত্য গোপাল হাজরাও এই ঘটনার কথা ব'লেছেন—লেখক।

সে আমাকে খুব বিশ্বাস করে। আমার 'বামুনের মেয়ে'তে প্রিয় মুখুজ্যের মায়ের যা চরিত্র তা আমি এ থেকেই পেয়েছি। অবশ্য এর ছেলে একজন সরকারী বড় চাকুরে আর এর আত্মীয়-স্বজনেরা জানে যে এ পাগল হয়ে বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেছে, বা মারা গেছে।[১]

শরৎচন্দ্র নারীর আত্মাবমাননায় কত যে ব্যথিত হতেন, সে সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন যে, তাঁর বেহালার বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে অনেক ব্যক্তি চা বাগানের নারী নির্যাতনের বর্ণনা দেন। শরৎচন্দ্র ঐ নারী নির্যাতনের কাহিনী কিছুটা শুনেই কাঁদতে কাঁদতে বক্তাকে বলেছিলেন, আর শোনাবেন না—দয়া করে চুপ করুন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না!

শরৎচন্দ্রের এই দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন: '··তিনি যার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখতেন, তার প্রতিই তাঁর মন আকৃষ্ট হোত। বডলোকের সঙ্গ তিনি এড়াতে চাইতেন। প্রায়ই তিনি বলতেন গরীব আর মধ্যবিত্তদের নিয়েই ত বাংলার ইতিহাস······।

······তাছাড়া দরিদ্র স্ত্রীলোকেদের প্রতি তাঁর দয়া ছিল অসীম। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের তিনি গোপনে অনেক দান করতেন। একদিন সকালে তাঁতে আমাতে বসে গল্প করছি, একটি বিধবা স্ত্রীলোক এসে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। শরৎচন্দ্র তাঁর দিকে একটিবার চেয়ে দেখে বললেন,—মাসকাবারের এখনো ত পাঁচ সাত দিন দেরী আছে। বিধবাটি যেন একটু সলজ্জভাবে বললেন—হ্যাঁ বাবা, তা আছে। মেয়েটার হঠাৎ জ্বর আর আমাশা হয়েছিল, রক্ত আমাশা কিছুতেই সারে না, তাই ডাক্তারের কাছ থেকে—

—আচ্ছা দুটো টাকা আমি দিচ্ছি আজ—শুক্র শনিবার নাগাদ আপনি আসবেন। মেয়ের অসুখ করেছিল, আমার কাছে আসেন নি কেন? হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিতুম, সেরে যেত।'

নারী জীবনের ব্যথা বেদনার কথা তিনি যেমন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এমন আর ক'জন সাহিত্যিকের লেখায় পাওয়া যায়? নারীর সতীত্বকে নিয়ে যে সব লেখক কপট আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে নারীকে

[১] অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল: শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা, পৃঃ ২০-২১

মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাদের সম্পর্কে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেছেন, 'যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই realism ভাবে, তাদের idealism ত নেই-ই, realism-ও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা—না জানার অহমিকা।'

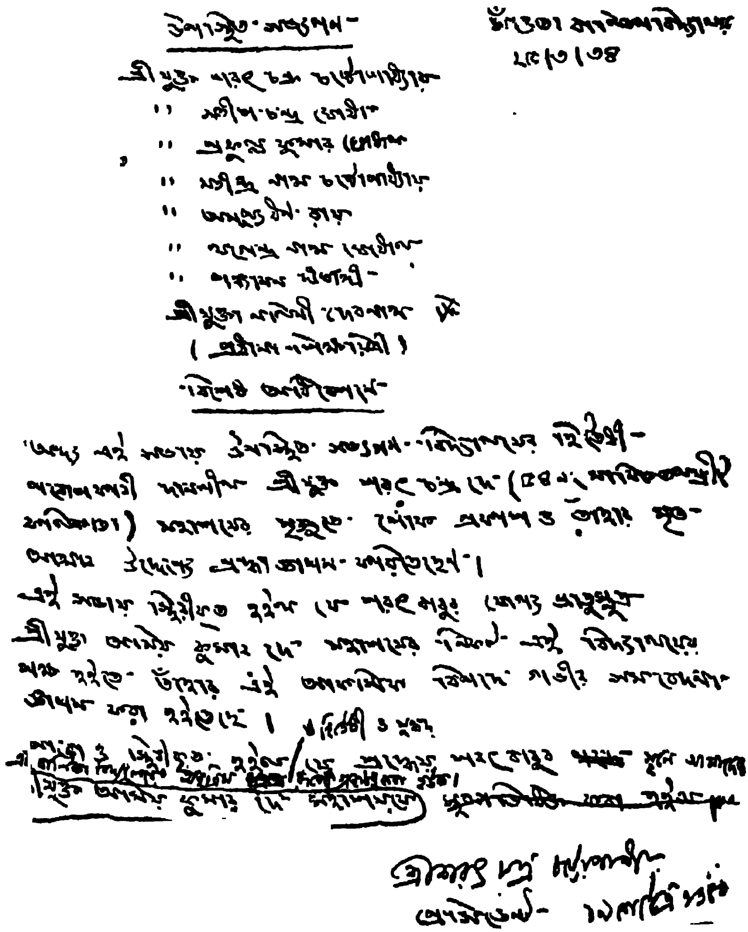
শুধু মানুষের দিকেই তিনি তার দরদটুকু সীমাবদ্ধ রাখেন নি ; পথের কুকুর, ছাগল, গরু আর পাখীদের প্রতিও শরৎচন্দ্রের দরদের সীমা ছিলনা। তাঁর সাহিত্যে এদের অসহায়তার কথাটি অন্তর নিঃসৃত মমতা দিয়ে চিত্রিত করে গেছেন—যা মনকে একান্ত সমবেদনায় ভ'রে তোলে। এইজন্যেই তিনি পরবর্তী কালে পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির হাওড়া শাখার সভাপতি হযেছিলেন। সামতাবেড়ে থাকাকালীন, তিনি কোলকাতা গেলে প্রথমেই এই সমিতির অফিসে হাজির হ'তেন।

মানুষের দুঃখের প্রতিও তাঁর সমবেদনার অন্ত ছিল না। এই সমবেদনা শুধু যে মৌখিক ছিলো, তা নয়। তিনি কার্যতঃ তাদের দুঃখমোচনের জন্যে চেষ্টা ক'রতেন গভীর স্নেহ দিয়ে। একবার তাঁর দিদি অনিলা দেবীর সেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সরস্বতী পুজো হয়। এই সরস্বতী-পুজোর অনুষ্ঠান করেন দিদির সম্পর্কিত আত্মীয় তুলসীদাসবাবু। সরস্বতী-পুজোয় পাঁচকড়িবাবুর দুটি ছাত্রের মধ্যে একটির নেমন্তন্ন হয। আর যে ছাত্রটি বাদ পড়ে যায়—তার নাম নকুল। নকুল নেমন্তন্ন না পেয়ে খুবই দুঃখিত হয। শরৎচন্দ্র নকুলের দুঃখের কথা জানতে পেরে তুলসীবাবুকে একখানি চিঠি লেখেন, 'তুলু, দুটি ছেলে মুখুজ্জেদের বাড়ীতে পডতে যায়, একটির হোল নেমন্তন্ন, আর অন্যটি গেল বাদ। আমার ত খাবার নেমন্তন্ন হ'য়েছে, আমি না হয় যাব না। তার বদলে আমাদের নকুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ আমার Representative.'

এই চিঠি পাওয়ার পরই তুলসীবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে ছুটে যান এবং নিজের ভুল স্বীকার ক'রে নকুলকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করেন। শরৎচন্দ্র সামান্য একটা বালকের দুঃখকেও যে কি রকম হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, এটা হোল তারই নিদর্শন।

গ্রামের সাধারণ লোকের কাছে তিনি ছিলেন দাদাঠাকুর। আপদে বিপদে

অনেক সময়েই তাঁর কাছে লোকেরা আসতো বিভিন্ন ধরণের সাহায্যের আশায়। টাকা পয়সা ছাড়া আইনগত পরামর্শ দেওয়া বা দরখাস্ত লিখে



শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে সামতা বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি।

দেওয়া—এসবই শরৎচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ ছিল। সাহিত্যিক মনোজ বসু [illegible]

শোনালেন : 'দাদাঠাকুর বাংলা ভাল জানেন, কিন্তু ইংরেজী জানেন না হয়ত—তাই টেলিগ্রাম পড়ার জন্যে এমনই এক দাদাঠাকুরভক্ত দাদাঠাকুরকে বিরক্ত করতে না চেয়ে অন্যের কাছে টেলিগ্রামের অর্থ বুঝতে চলে গেলেন। সেবারে এই খবর দাদাঠাকুরকে খুবই যে মর্মপীড়া দিয়েছিলো—তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি।'

শরৎচন্দ্র তাই একদিকে ছিলেন শিল্পী আর অপরদিকে তিনি ছিলেন পল্লীদরদী। এই জীবনের পায়ে-চলা পথে চলবার সময় বহু মানুষকে তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেননি, প্রাণ দিয়ে দেখেছেন। বাস্তব জীবনেও তাই সময়ে-অসময়ে তাদের অসহায়তা থেকে উদ্ধার করেছেন বারবার।

সামতাবেড়েয় কোন বালিকা বিদ্যালয় না থাকায় শরৎচন্দ্র নারী শিক্ষার একান্ত অভাব বোধ করেন। তাই সামতাবেড়েয় বালিকাদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে বাজে-শিবপুরে থাকাকালীন লেখা একটি চিঠিতে তিনি এই পাঠশালা সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'বরিশাল কনফারেন্সে আমার যাবার বড্ড ইচ্ছা ছিল, শুধু আমার নতুন পাঠশালার কাজে এমনি ব্যস্ত রইলাম যে, সময় পেলাম না।' শরৎচন্দ্রের ঐ পাঠশালা উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় বটে, কিন্তু দু' তিন বৎসর পরে আবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী-কালে বিদ্যালয়টি ষষ্ঠ শ্রেণীর পর্যায়ে অনুমোদন লাভ করে। শরৎচন্দ্র এই বিদ্যালয়টির পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন[১] এবং বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য তিনি যে আর্থিক সাহায্য করতেন তার পরিচয় পাওয়া যায়—পানিত্রাসের

১ শরৎচন্দ্র যখন ঐ বালিকা বিদ্যালয়টির সভাপতি ছিলেন, তখন বিদ্যালয়টির নাম ছিল 'সামতা বালিকা বিদ্যালয়'। পরবর্তীকালে ঠাকুর হরনাথের শিষ্য শরৎচন্দ্র দে নামে জনৈক অর্থবান ব্যক্তি এই বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্যে প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করেন। ১৩৪০ সালে শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে পরিচালকমণ্ডলীর যে সভা হয়—সেই সভার কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, উক্ত শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় শোকপ্রকাশ ক'রে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরিচালকমণ্ডলীতে পিতৃব্যের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সামতা বালিকা বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় 'সামতা শরৎচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ের এই নামকরণ কোন্ শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে হয়েছে, সে সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও, শরৎচন্দ্র যে এই বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্যে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ ক'রেছিলেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে রক্ষিত তাঁর স্বহস্ত লিখিত একটি ডাইরী বইয়ের পাতায়। ঐ ডাইরীর পাতায় শরৎচন্দ্র Girls School বাবদ যে ব্যয় করেছেন তার হিসাব লিখে রেখেছিলেন। তাঁর নারী প্রগতির কথা যে শুধু মৌখিক উপদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, কার্যতঃ তা সফল করার জন্যে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন— এই বিদ্যালয় পরিচালনার মধ্যেই সে পরিচয় পাওয়া যায়।

বহুদিন গ্রাম-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন বলেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দেশের সত্যিকারের দুঃখ আর সমস্যাটা কি? একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'নিজের দেশটিকে আমি বাস্তবিক ভালবেসেছি— এ কথার মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা নাই। যথার্থ ভালবেসেছি। ইহার ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, ইহার জলবায়ু, ইহার দোষ গুণ ত্রুটি, দলাদলি বা যা কিছু বল, বাস্তবিকই আমি ভালবেসেছি। নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিষ বাহির হয়, তখন তাহার দোষ-ত্রুটিতে সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না।'

একজন মরমী সাহিত্যিক হিসাবেই এ ঘোষণা তিনি করতে পেরেছিলেন। মানুষের জীবনকে এমন গভীরভাবে না জানলে একথা কেউ এমন গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারতেন না। তাই কালের গণ্ডী পেরিয়ে তাঁর লেখনী-নিঃসৃত সাহিত্যের আবেদন আজও আমাদের হৃদয়কে ক'রে তোলে করুণ রসসিঞ্চনে সিক্ত। এই জন্যই আগামীকালের সমাজচেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে সেই সত্যাসত্য বিচারের প্রার্থনা জানিয়ে একান্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'দেশের জন্যে, অবহেলিত মানব-সমাজের জন্যে আমি কতটুকু করেছি, তা স্থির করার ভার রইল ভাবীকালের সমাজের উপর।'

৩

শরৎচন্দ্রের পারিবারিক জীবন

"আমার জীবনী শুনে তোমার লাভ কি ? আমি লেখক—আমার লেখা সম্বন্ধে তোমরা বিচার করতে পার। আমি কোন্ পাশে শুই, কি খাই, কি পরি,—এসব জেনে যে তোমাদের কি লাভ হয়, তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। মানুষের জীবনে কত নানান রকমের ঘটনা ঘটে, কিন্তু লেখক হ'য়েছি বলেই যে সে গুলোকে সব পাঠকের কাছে ধরে দিতে হবে, এর কোন সার্থকতা আমি খুঁজে পাইনে।"

একথা শরৎচন্দ্র ব'লেছিলেন একসময়ে সাহিত্যিক অবিনাশ ঘোষালকে। তিনি যে তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অপরের কৌতুহলকে বরদাস্ত করতে পারতেন না—এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। একথা সত্যি, যিনি সৃষ্টি করেন সেই স্রষ্টার জীবনী নিয়ে আলোচনা তার সৃষ্টির মূল্য বিচারে কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। 'তবুও জীবনের সঙ্গে রস সৃষ্টির নিবিড় সম্বন্ধ থাকায় সাহিত্যিকের জীবন জানবার জন্যে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই, আর ঐটি স্বাভাবিকও। সাহিত্যিকের জীবন আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি কেন তাঁর সৃষ্টির ধারা একটি বিশেষ পথে প্রবাহিত হয়েছে।'

তাই সামতাবেড়ের এই পল্লীজীবনের বিভিন্ন কাহিনী ও তার খেয়ালী মনের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করলে শরৎচন্দ্র কি ধরণের মানুষ ছিলেন এবং কিভাবে সাহিত্যের অনুপ্রেরণা লাভ ক'রেছিলেন সেটি সহজেই জানা যাবে ব'লে এ অধ্যায়ের সূচনা।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়ীতে নিচের তলায় কাঁচের জানলা দিয়ে তৈরী একটা ছোট্ট ঘরে লেখাপড়া করতেন। লেখার সময় তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন। সামতা গ্রামে বাস করলেও চিঠিপত্রে লিখতেন সামতাবেড় এবং জেলার নাম লিখতেন হাওড়ার বদলে হাবড়া। এই অঞ্চলের পুরাণো জরিপের ম্যাপ ও রেলের টিকিটে তখন 'হাবড়া' কথার উল্লেখ থাকতো। তাই চিঠিপত্রে 'হাবড়া' কথাটি যে তিনি ভ্রমবশতঃ লিখতেন—তা ঠিক নয়।

সামতাবেড়ের বাড়ীতে তাঁর ব্যবহৃত ফরাসের উপর বসে লেখার জন্ম ডেস্ক, টেবিলের মধ্যস্থলে লাগানো ঢালু ডেস্ক এবং ইজিচেয়ারের সঙ্গে লাগানো ডেস্ক থেকে বোঝা যায় তিনি মনের স্বাচ্ছন্দ্যমত বিভিন্ন অবস্থাতেই উপবিষ্ট হয়ে লিখতেন। একটা স্ট্যাণ্ডে ওঠানো-নামানো যায় এমন একটা ডেস্কও আছে—যাতে তিনি অর্শের অসুখের জন্যে অনেক সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও লিখতেন।

লেখার কাগজ ছিল মোটা আর পাতলা। প্রত্যেক কাগজের মার্জিনের উপরের কোণে মনোগ্রাম করা একটা ডাবের মধ্যে 'শরৎ' কথা লেখা থাকতো। তিনি যে শুধু ফাউণ্টেন পেনএ লিখতেন তা নয়—তাঁর লেখার সরঞ্জামের ভেতর দোয়াত-কলমও ছিল। লেখার সময় গড়গড়ায় তামাক সেবন করতেন। তাঁর ঐ সময়কার ভৃত্য শ্রীগোপাল হাজরার মতে দৈনিক আড়াই-পো তামাক খরচ হ'ত। বৈকালে গোবিন্দপুরে দিদির বাড়ী যেতেন কখনও কখনও। হৃদয় পাত্রের স্যাকরার দোকানের কাছেও তিনি আসতেন গল্পগুজব করার জন্যে। তাছাড়া দাবা এবং পাশা খেলায় ছিলেন দারুণ উৎসাহী। গোবিন্দপুরের হৃদয় পাত্র, হরিপদ গাঙ্গুলী, দীনু গাঙ্গুলী এবং বঙ্কিম ঘোষাল ছিলেন তাঁর নিত্যদিনের দাবা ও পাশা খেলার সাথী।

শরৎচন্দ্র রেডিয়োর গান খুব পছন্দ করতেন। বেতারের গান তাকে কতখানি মুগ্ধ ক'রেছিলো, সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'শ্রাবণের ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দ্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্যপথ নিতান্ত দুর্গম, নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের 'পরে চাপিয়া বসে, তখন বেতার-বাহিত গানের পালায় মনে হয় যেন দূরে থাকিয়া আসরের ভাগ পাইতেছি।

আবার কোনদিন ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা যায়, বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদী-জলে মলিন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে,

আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্ত নদীতটে আরাম কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি, তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বেতার বাঁশীর স্বর যেন মায়াজাল রচনা করে।'

সামতাবেড়েতে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে তখনকার দিনের সেই পুরানো মডেলের রেডিওটি এখনও আছে এবং শোনা যায় এটি নাকি রেডিও কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র বাল্যকালে মাছ ধরার প্রতি যে খুব আগ্রহী ছিলেন—তা তাঁর লেখার বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে ফুটে উঠেছে। ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন তাঁর এই নেশা তখনও যে বর্তমান রয়েছে তা একটি চিঠিতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন : '৪।৫ জোড়া, গায়ে গাঁথা বঁড়শি, বড় সাইজের মাঝারি সাইজের ২।৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাঁধা কডা ও হাতে ভাঙ্গা মুগার সূতা ভাই নিশ্চয়ই দিও।' সামতাবেড়ে থাকাকালীনও তিনি মাছ ধরতে ভালবাসতেন।

পারিবারিক জীবনে হিরন্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। রেঙ্গুনে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র প্রথম বিবাহ করেন শান্তি দেবীকে। সাহিত্যিক নরেন দেব 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তাকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের দিন সুখেই কাটছিলো। একটি পুত্র সন্তানও হযেছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনও ফিরছিল তাঁর পাছে পাছে। রেঙ্গুনে আবার একবার প্লেগের দারুণ মহামারী দেখা দিল—শরৎচন্দ্রের পত্নী, পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। কোমল হৃদয় শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় অধীরভাবে কেঁদেছিলেন। তাঁর সেই সকাতর অশ্রু বিসর্জন দেখে রেঙ্গুনে তাঁর পরিচিত বন্ধু বান্ধবেরা চোখের জল রোধ করতে পারেন নি।'

শরৎচন্দ্র এরপর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন হিরন্ময়ী দেবীকে। হিরন্ময়ী দেবীর বাপের বাড়ী ছিল মেদিনীপুরের শালবনীর অন্তর্গত শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। তাঁর জীবিতকালে তাঁর বাপের বাড়ীর ঠিকানা এবং অন্যান্য পরিচয় সম্পর্কে একবার প্রশ্ন করার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। কথা প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করেন :

—শ্যামচাঁদপুর চেন ?

—না, তো।

—মেদিনীপুরের যত লোক আসে, জিজ্ঞেস করলে কেউ উত্তর দিতে পারেনি। মেদিনীপুরেই আমার বাপের বাড়ী। সেখানে খুব বড় মেলা হয়।

—ঠিক কোন্ সময় বা কি উপলক্ষ্যে মেলা হয় বলতে পারেন ?

—তা তো মনে নেই। আমার তখন বয়স অল্প ; উনি সেবারে রেঙ্গুন যাওয়ার আগে আমাকে বিয়ে করেন, তারপর সেই যে রেঙ্গুনে চলে যাই আর সেখানে কোনদিন যাইনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, মেদিনীপুর জেলায় এই শ্যামচাঁদপুরের কাছাকাছি গ্রাম হল, কুঁয়াপুর ও রাধানগর প্রভৃতি—যা শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'এ ঐ একই নামে উল্লেখিত হয়েছে।

পারিবারিক জীবনে হিরন্ময়ী দেবী লাজুক, নিষ্ঠাবতী ও ধর্মশীলা ছিলেন। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠায় ও স্থানীয় মন্দির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য ক'রেছেন এবং ২রা মাঘ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুদিনটিতে বালক-ভোজন অনুষ্ঠান পর্ব—এগুলি থেকেই তাঁর আচার-নিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র স্ত্রীর ধর্মনিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ইনি ত দিনরাত জপতপ পুজো আচ্চা নিয়েই থাকেন।' পরবর্তীকালে বেনারস থেকেও এক চিঠিতে লিখেছেন, 'চৈত্র মাসে যাওয়া যায় না, একটা ব্রত উদযাপন আছে এর· ···।'

হিরন্ময়ী দেবী লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনে তিনি যে সেবা ও কর্তব্য নিষ্ঠার আদর্শ রেখে গেছেন, তার ফলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার পথ আলোকিত হ'য়েছে। এই সম্পর্কে তাঁর দাম্পত্য জীবনের একটা টুকরো কাহিনী অবিনাশ বাবু দিয়েছেন :

'একদিন যখন শরৎচন্দ্রের বাড়ি গেছি, তখন প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়। দেখলুম বৈঠকখানায় আরাম কেদারায় তিনি শুয়ে আছেন। বললেন : এই উপর থেকে নীচে এসেছি। তোমার বৌদির শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে।

বললুম : কি হয়েছে ?

বললেন : ঠিক কি যে হয়েছে তা জানিনা—মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। কাল বিধান (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) এসেছিল, বললে, যা ওষুধ দিয়েছি তাতে সেরে যাবে। আজ দুপুর থেকে আবার খুব বেড়েছে। ভাবছি, বিধানকে

আর একবার আসতে বলব কিনা। এমনি 'মজা দেখ, এতো মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু আমার তামাকটা যে ফুরিয়ে গেছে সেটা কিন্তু ভোলে নি। আমাকে সেটা আনিয়ে নিতে বললে। (একটু হেসে) তবে আজকাল আর তামাক বেশী খাবার উপায় নেই। একসের তামাকে সাত দিন কাটাতে হবে, এই হুকুম হয়ে গেছে।

এই সামান্য কটি কথার মধ্যে শরৎচন্দ্রের দাম্পত্য-জীবনের যে ইঙ্গিতটি প্রকাশ পেল তা খুবই উপভোগ্য।'

হিরন্ময়ী দেবীর স্নেহশীলতার বিবরণ দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'আমাদের সেদিনকার বহু ব্যঞ্জিত অন্নের থালায় যে অদৃশ্য হস্তের স্নেহ সেবা স্বাদ পরিবেশিত হয়েছিল—তাও ভোলবার নয়।'

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হিরন্ময়ী দেবী সামতাবেড়ের এই বাড়ীতে কাটিয়ে গেছেন। গত ১৯৬০ সালের ৩১ শে আগষ্ট তারিখে এই বাড়ীতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১]

শরৎচন্দ্রের পরিবারের লোকজন বলতে বলা যেতে পারে তাঁর স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী, ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রকন্যা। মেজ ভাই প্রভাসচন্দ্র ছিলেন সন্ন্যাসী মানুষ; পরবর্তীকালে বেদানন্দ। কিন্তু সন্ন্যাসী হ'লেও বংশগত ধারায় তাঁর মধ্যে যে সাহিত্য চেতনা সুপ্ত হ'য়ে ছিল তা বোঝা

---

১ বিশ্ব বিশ্বাস তাঁব পুস্তকে, হিবন্ময়ী দেবীব মৃত্যু কোলকাতায বলে যা উল্লেখ কবেছেন তা সঠিক নয়। হিবন্ময়ী দেবীর মৃত্যু সংবাদ কেবলমাত্র 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয এবং এই প্রসঙ্গে অধুনালুপ্ত 'স্বাধীনতা' পত্রিকায (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০) হিবন্ময়ী দেবীর মৃত্যুশয্যাব ফটোসহ যে পত্রটি প্রকাশিত হয তা হল :

'শরৎভক্তির নমুনা—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লেখাটি কাগজে দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমি গত শনিবাব ৩রা সেপ্টেম্বর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর মৃত অবস্থায় তোলা এই ছবিটি কোন একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে লইয়া যাই। কিন্তু ছবি প্রকাশ করার কোন রকম কথা না বলিয়া উক্ত পত্রিকার এক দায়িত্বশীল প্রতিনিধি বলিলেন, ও ছবি ছাপা হবে না—শরৎবাবুর মৃত অবস্থাব ছবি হলে ছাপা হতো। তার মানে এই নয় তাঁর স্ত্রীর ছবিও ছাপাতে হবে। এই উক্তি কতবড় অপমানজনক। হিরন্ময়ী দেবী জীবিত অবস্থায় কোন ছবি কাউকে তুলতে দেননি। এইটাই তার প্রথম ও শেষ ছবি। অবশেষে এইটুকু বলতে হয় আমরা সভ্য দেশের মানুষ, সংবাদপত্রের দায়িত্বশীল কর্মীর কাছ থেকে এরকম ভাষা আর কতদিন আমাদের শুনতে হবে।'

যায়—তাঁর লেখা একটি পত্রে। 'তুষার শুভ্র' হিমালয়ের বর্ণনায় লিখেছেন :

'এই সাদার কান্তি যে কি মহৎ, কি গভীর সুন্দর — আমি তাই দেখছি। যত কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা পড়ে গেল। অনবিচ্ছিন্ন একের শুভ্রতা সকলকে নিজের আড়ালে টেনে নিল। সমস্ত ঢাকা পড়লো, প্রাণ ঢাকা পড়লো, বর্ণচ্ছটার নীল সাদায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু এতো মরার দৃশ্য নয়। আমরা যাকে মরণ বলে জানি—সে যে কালো—শূন্যতা তো আলোকের মত সাদা নয়। সে যে অমাবস্যার মত অন্ধকার নয়। সূর্যের রশ্মি—লাল, নীল, সমস্ত ছটাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে ; কিন্তু তাকে তো মেরে ফেলেনি—তাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করেছে। দেখ ভাই, আজ এই নিস্তব্ধতার অন্তরনিগূঢ় দান আমার প্রাণকে রসপূর্ণ করে তুলেছে। আজ গাছপালা তাদের সমস্ত গহনা খসিয়ে ফেলেছে। একটি পাতাও রাখেনি। কেবল রজত মুকুট শিরে ধারণ করে মহিমান্বিত অথচ মহান গম্ভীরতার মধ্যে নত মস্তকে বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করছে।'[১]

প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র এক চিঠিতে লিখেছিলেন, '…আমাব মেজ ভাই প্রভাস সন্ন্যাসী ছিলেন, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। তিনি দিন কয়েক পূর্বে বর্মা হইতে ফিরিয়া মঙ্গলবার রাত্রে অসুখে পড়েন। ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন, বারম্বার অসুখে এ দেহ অপটু হইয়া পড়িয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। পরদিন বেলা একটায ঘর ও বিছানা ছাড়িয়া নিজে বাহিরে আসিলেন এবং আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। দিদি, আমি, বৌ ও প্রকাশ—আমরাই শুধু ছিলাম।'

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর বিবাহ হয় গোবিন্দপুর গ্রামের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অনিলা দেবীর মধ্যেও যে সাহিত্য সত্তা ছিলো, তা এক চিঠিতে অলঙ্কারের বৈচিত্র্যে সেই চিঠির ভাষা সমুজ্জ্বল।[২]

১ পত্রটি শরৎ-স্মৃতি গ্রন্থাগারে (পোঃ পাণিত্রাস) রক্ষিত।

২ অনিলা দেবীর এ পত্রটি পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি সংগ্রহশালায় রক্ষিত। পরবর্তীকালে কবি নরেন দেব শরৎচন্দ্রের জীবনী রচনার জন্যে অনিলা দেবীর যে দ্বারস্থ হয়েছিলেন তা পরিশিষ্ট (গ)-এ উল্লেখিত পত্রটি উল্লেখযোগ্য। বেশ বোঝা যায়, তখন থেকেই কবি শরৎচন্দ্র ও নিরুপমার

ঠাকুরপোকে[৩] লেখা একটি চিঠির ভাষা: 'ভাই, কাল তোমার সুন্দর মধুমাখা চিঠিখানি পেয়ে যে কি আহ্লাদ পেলুম লেখা যায় না। এত দিন এসেছি, আমি মনে করেছিলুম বৌদের হাওয়া লেগে তুমিও ভুলেছ আমায়, তা নয়। পুরাণো চাল ভেঙ্গে গেলেও তার গুণ আছে—তাই মনে রেখেছ এখনও।...... সংসারে ভিন্ন হলেও আমার মন ভিন্ন হয় নাই। এক জায়গায় ২।৪টে হাঁড়ি রাখলে ঠোকাঠুকি হোয়েও শব্দ হয়, তাই বোলে কি চট করে হাঁড়ি ভেঙ্গে যায়? ভাই, তোমাকে চিঠি লিখতে আবার ভয় করে, পাছে কেউ মুখে যা থাকে তাই বোলে ফেলে—প্রাণ কাঁদলেও চুপের বালাই নেই—ঠাকুর পো, আমি ভুলি নি কিছু।

স্বামীর ভিটে পর্ণকুটির হোলেও স্বর্ণ অট্টালিকা-সোনার সংসার। মায়া অনেক বেশী। এ স্মৃতি মরণের পরপারেও মাথায় কোরে নিয়ে যাবো, এ ভোলা নারী হৃদয়ে নয়।...এই তো আমার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা...! পুরুষের সঙ্গে কলহেতে সংসার তেতো হয় না ভাই, কিন্তু মেয়ে মেয়ে মিল না থাকলে সে স্থানে একতিল থাকতে ইচ্ছা হয় না। অনেক বুকের ব্যথা বোঝাই করে চুপ করে বোসে আছি।'

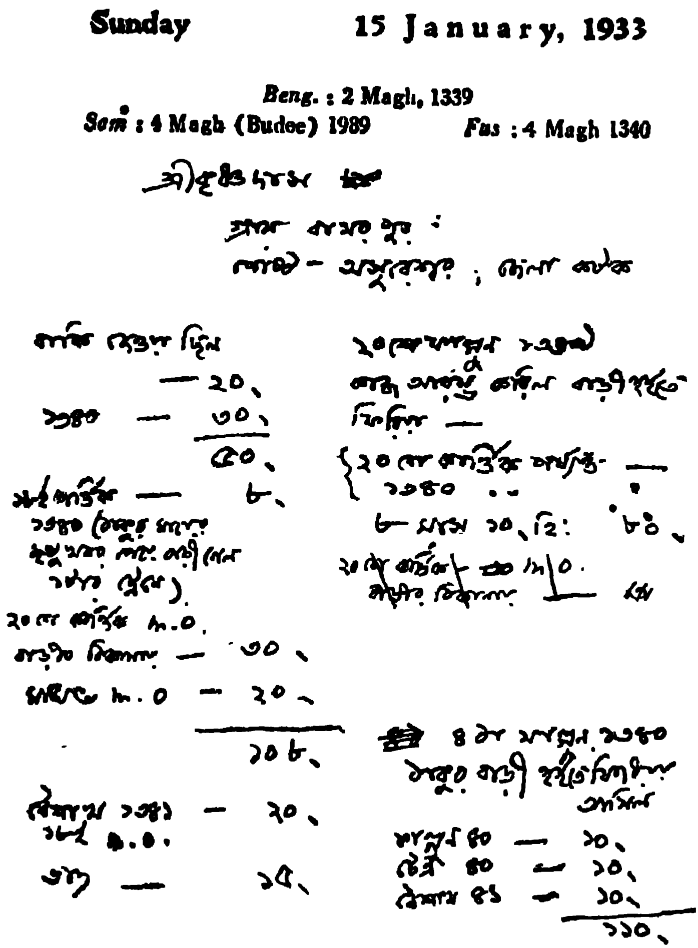
ব্যক্তিগত জীবনে শরৎচন্দ্র যে খুব হিসেবী লোক ছিলেন তা জানা যায় তাঁর ব্যবহৃত একটি ডাইরী থেকে। ডাইরীটি পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে রক্ষিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সনস্ প্রকাশিত 'এভরিম্যানস্ ডাইরী, ১৯৩৩'-এর পাতায় সে সময়ে তাঁর বাড়ীতে যারা কাজ-কর্ম করতেন—তাদের নামে নামে মাইনের হিসেব এক এক পাতায় পুংখানুপুঙ্খভাবে লেখা আছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ডাইরীর এক পাতায় 'পঞ্চুর' মাইনের হিসেব যেখানে দেওয়া আছে তা হল: পঞ্চুর মাইনে ছিল ১৫ টাকা এবং ১০ টাকা ৫ টাকা করে আষাঢ় ১৩৩৯ থেকে ১৩৩৯ সালের চৈত্র পর্যন্ত শোধ দিয়েছেন ১২৭৷৷০; এর মধ্যে ফাল্গুন মাসের মাইনে দিয়েছেন ৭৷৷০ টাকা। বাকী ৭৷৷০ টাকা নেলোকে দিয়েছেন। তাছাড়া ঐ হিসেবে ঘর ছাওয়ার মজুরী

প্রেম কাহিনীর সন্ধানে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, যার সর্বশেষ পরিণতি ঘটেছে 'দেশ' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত—কবি-পত্নী রাধারাণী দেবীর ৮ই, ১৫ই ও ২২শে কার্তিকের প্রবন্ধ।

৩ ঠাকুরপো হচ্ছেন পঞ্চাননবাবুর ভাই পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়।

বাবদ ২ টাকা, নেলোর ৫ দিনের মাইনে ২॥০, খড় ৮ পণের দরুণ তিন টাকা চারি আনা মোট ৭ টাকা বার আনা শোধ দিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে মুখুজ্জে মশাইয়ের খাজনার জন্যেও চার টাকা শোধ দিয়েছেন।


Sunday 15 January, 1933

Beng. : 2 Magh, 1339
Som : 4 Magh (Budee) 1989 Fus : 4 Magh 1340

শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত ডাইরীর পাতায় হিসেবের প্রতিলিপি

অন্য পৃষ্ঠায় যামিনী ধাড়ার মাইনের হিসেবে দেখা যায়, তাঁরও মাইনে ছিল ১৫ টাকা। ১৩৩৯ সালের ভাদ্র থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ১৩৪২ সালের

২রা শ্রাবণ পর্যন্ত। তাঁকেও কখনও ১০ টাকা আবার কখনও পুরো ১৫ টাকা হিসেবে শোধ দেওয়া হয়েছে। বড় গিন্নীর মারফৎও ৫ টাকা শোধ দেওয়ার কথা লেখা আছে। এই পাতায় হিসেবের বাঁদিকে লেখা আছে: 'Note, ননীর কাজের জন্য ভাদ্রমাসে যে ১৫ টাকা দেওয়া হয় তার অর্দ্ধেকটা যামিনীর। ননীর মাইনে ৭৷৷০ যামিনীর ৭৷৷০।' এ হিসেবের মধ্যে কখনও খাজনা বাবদ মুখুজ্জে মশাইকে ৫ টাকা, কাপড় ক্রয় বাবদ ১ টাকা নয় আনা কখনও ২ টাকা যে শোধ দিয়েছেন তারও উল্লেখ আছে। এ ছাড়া বড় বৌয়ের মারফৎ ১২ টাকা এবং লক্ষ্মণ[১] মারফৎ ২২ টাকাও যে দেওয়া হয়েছে—তাও হিসেবে আছে।

গোপাল হাজরার হিসেবের পাতায় আছে, ১৩৪০ (৮ই আশ্বিন) থেকে ১৩৪৪ সালের কার্তিক পর্যন্ত হিসেব। তাঁরও মাইনে ছিল ১৫ টাকা এবং প্রতি মাসে কখনও দেওয়া হয়েছে ১০ টাকা আবার কখনও ২০ টাকা হিসেবে। এ ছাড়া ১৮ই জুলাই '৩৫ তারিখে চেকে ৪০ টাকা মাইনে দেওয়া হয়েছে গোপালকে; তাই ডাইরীতে উল্লেখ রাখা হয়েছে—'paid by cheque'। চেক মারফৎ কখনও ৫৫ টাকা বা ৩৬ টাকা দেওয়া হলেও, নগদে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্যে হিসেবে লেখা হয়েছে 'Paid by cash'। এর মধ্যে গোপালের স্ত্রীর অসুখের জন্যে ৩০শে কার্ত্তিক '৪৪, ১ টাকা সাড়ে ছয় আনা দেওয়া হয়েছে।

ডাইরীর অন্য এক পাতায় আছে:

'সুরেন ঘোষাল দোকান

৯ই কার্তিক পর্যন্ত হিসাব বাকি ছাব্বিশ টাকা চৌদ্দ আনা দেড় পয়সা। ১৩৪৩

Paid by cheque—২৫৲

28. 10. 36.'

তিনকড়ি গয়লার হিসেবের পাতায় আছে: ১৩৪০ আষাঢ় পর্যন্ত ১৷৷০ ৬৷৷০ দুধ হয়েছিল। তারমধ্যে লক্ষ্মণ মারফৎ Payment হয়েছে ১১ ফাল্গুন

---

[১] লক্ষ্মণ ছিলেন অনিলাদেবীর জ্ঞাতি ভাসুরপো।

১৩৪০=২৫৲। এই হিসেবের পাতায় আর এক জায়গায় লেখা আছে, 'তিনকড়ি গয়লা—লক্ষণ মারফৎ শ্রাবণ ১৩৪২—১০৲'।

ডাইরীর আর এক পাতায় আছে: '৺ মুখুজ্জে মশায়ের শ্রাদ্ধের বাবদ ১১ই ফাল্গুন ১৩৪০ দিলাম (লক্ষণ)—২০ টাকা তের আনা (৯৲ টাকা পঞ্চু ও যামিনীর খাজনা শোধ) নিজ খরচ—১১ টাকা'।

ভাগনারায়ণ ঠাকুরের হিসেব ডাইরীতে যা লেখা আছে:

'ভাগনারাণ ঠাকুর
গ্রাম জলওয়ার
পোষ্ট কনসিসিমড়ি
জেলা দরভাঙ্গা

From 1936	1st April	৭৲	Paid 14/-
	May	৭৲	19. 6. 36.
	June 1936	৭৲	
	July 1936	৭৲	
	August 1936	৭৲	Paid 20/-
	Sept. 1936	৭৲	28. 10. 36.
		২৮৲	

ডাইরীতে সামতাবেড়ের Girls school নির্মাণের বাবদ খরচের হিসাব এবং কোলকাতার বাড়ীর ইলেকট্রিক ও বাড়ীর জন্যে খরচের উল্লেখ থাকলেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও ডাইরীর পাতায় লিখে রেখেছিলেন। কলাগাছের দাগ তোলা নিয়ে ডাইরীর একটি পাতায় লেখা আছে:

'কলা গাছের দাগ তোলা, Lead Acetate (ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়) একটু জলে গুলে কাপড়ের দাগে ৩।৪ মিনিট রেখে সাবান দিয়ে কেচে ফেললে দাগ উঠে যায়। কাপড় নষ্ট হয় না।'

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়ীতে খুবই গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন [১] এবং তাঁর যকৃতের পীড়ায় চিকিৎসার জন্যে ডাক পড়ে সে সময়ের বাগনানের নামজাদা চিকিৎসকদের।

১ বঙ্গবাণী, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

বিশেষ করে তিনি পানিত্রাসের ডাক্তার রমেশ মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসাধীনে থাকেন। তিন সপ্তাহ কেটে যাবার পর একটু একটু করে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন। এর পর সিদ্ধান্ত হয়, তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর সুচিকিৎসার জন্যে তাঁকে কোলকাতায় আনা হবে।

শরৎচন্দ্রের এই অসুস্থতার সময় কোলকাতায় প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসবের সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে উদ্যোক্তারা সামতাবেড়ের বাড়ীতে আসেন। সে সময়ের ২৫শে ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে[২] এই সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা হল : "বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে শ্রীমান ভবতোষ রায়চৌধুরী ও শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসবের সাহিত্য সভার সভাপতিরূপে বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য গতকল্য শনিবার তাঁহার হাওড়া জেলাস্থিত পল্লীভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে প্রকাশ যে, শরৎচন্দ্রের বর্তমান স্বাস্থ্য আদৌ সন্তোষজনক নহে। প্রায় মাসাধিক তিনি একপ্রকার শয্যাশায়ী ; স্থানীয় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বিশেষ যত্নসহকারে চিকিৎসা করিতেছেন। শরচৎন্দ্রের সহিত আলোচনায় জানা গিযাছে যে, তাঁহার চিকিৎসকগণের অভিমতে তিনি যকৃত রোগে কষ্ট পাইতেছেন। তবে হঠাৎ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তিনি সুচিকিৎসার জন্য শীঘ্রই কলিকাতা নীত হইতেছেন।"

সুতরাং এই অবস্থায় শরৎচন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম-জয়ন্তীতে আযোজিত সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলেন না। অতএব এই সাহিত্য সভায় মহিলা সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকে সভানেত্রীর পদ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২৬শে ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রফুল্ল জয়ন্তীর এই সাহিত্য সভায় নির্বাচিত সভানেত্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে সভাপতির পদে বরণ করে সভার কাজ সুরু করা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকেই আশা করেছিলেন যে, বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী এই সভায় ভাষণ দেবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতা নিবন্ধনে উপস্থিত হতে না পেরে উদ্যোক্তাদের যে পত্রটি দিয়েছিলেন তা সভায় পাঠ করা হয়। পত্রখানিতে লেখা ছিল : "অপরিসীম দুঃখের

২ বঙ্গবাণী পত্রিকা।

সহিত জানাইতেছি, আমি প্রায় মাসাধিককাল অত্যন্ত অসুস্থ। তোমাদের সম্মিলনী এবং আচার্যদেবের সম্বর্ধনা সভায় যে উপস্থিত হইতে পারিলাম না—এ আমার অতিশয় দুর্ভাগ্য। আমার হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ আচার্যদেবের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিয়া লইবে এই অনুরোধ। শ্রীমান শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী ও ভবতোষ রায়চৌধুরী এরা আজ আমার কাছে আসিয়াছিলেন এবং তাদের হাতেই এই লিপি পাঠাইলাম। ইতি ৯ই পৌষ, ১৩৩৯।

তোমাদের—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড, পানিত্রাস, হাওড়া।"[১]

এরপর শরৎচন্দ্র ক্রমশই ধীরে ধীরে সুস্থ হযে উঠতে থাকেন। তাই ১লা জানুয়ারীর (১৯৩৩) সংবাদপত্রে লেখা হয়, "শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতুল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী শরৎ বাবুকে দেখিবার জন্য সামতাবেড়ে শরৎবাবুর গ্রামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, শরৎবাবু এখন যদিও দুর্বল, তথাপি তিনি দ্রুত আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন।"[২]

শরৎচন্দ্রের অসুস্থতায় দেশের বহু নাগরিকই যে উদ্বেগ বোধ করেছিলেন, সে সম্পর্কে সংবাদপত্রের সংবাদে জানা যায় যে, বহুস্থান থেকে তার রোগ-মুক্তির প্রার্থনা করে তাঁকে পত্র লেখা হযেছিল। এ সম্পর্কে ১৯শে জানুয়ারীর (১৯৩৩) সংবাদ পত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়: "ঢাকা ১৬ই জানুয়ারী—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে একটি সভায ছাত্রেরা প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায মহাশয়ের রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করিয়াছেন।'[৩]

সে যাত্রায় শরৎচন্দ্র যকৃতের গুরুতর পীডা থেকে আরোগ্য লাভ করেন এবং হঠাৎ আশঙ্কার কারণ থেকে দেশবাসীর চিন্তা-ভাবনা দূর হয়।

সংক্ষেপে শরৎচন্দ্রের এই হোল সামতাবেড়ের পারিবারিক জীবন। মানুষ ও সমাজ কোন কালেই জড় বা অচল থাকতে পারে না। পরিবর্তনের তরঙ্গে

১ বঙ্গবাণী, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

২ বঙ্গবাণী, ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৩

৩ বঙ্গবাণী, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৩

তাঁর ছোটবেলাকার জীবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সে দুলতে থাকে—আঘাতে আঘাতে জীবন এগিয়ে চলে আর সেই জীবনের ভাঙ্গাগড়ার কাহিনীই ক্রমে একসময় সাহিত্যের পাতায় স্থান লাভ করে। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য-কর্মে তাই এত মিল। সাহিত্যিক অবিনাশ ঘোষালের কথায়, 'যাকে বলে, গ্রামের মানুষ—শরৎচন্দ্র তাই ছিলেন।'



শরৎচন্দ্র ঃ স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী ও একটি আবেদন

দেশের কবি-সাহিত্যিকদের একদিন যখন নাম-যশ ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাঁদের কলমের কালিকে মর্যাদা দেবার জন্যে আমাদের দেশের শিল্পপতিরা অগ্রণী হন। পরাধীনতার যুগে স্বদেশীয়ানার ডাকে ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকরা দেশীয় পণ্য কাটতির আবেদন জানিয়ে এমন অনেক উদাহরণ রেখে গেছেন সেকালের পুরানো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রও ব্যতিক্রম নন। কিন্তু তাঁর এই ধরনের আবেদন কোম্পানীর মালিকরা বিজ্ঞাপনের পাতায় অবশ্য প্রকাশ করেন নি। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এগিয়ে এসেছিলেন এমন একটি স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীর স্বপক্ষে—যাদের সঙ্গে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত এক লুঠেরা কোম্পানীর অনিবার্য সংঘাত বেধে উঠেছিল। দেশী বনাম বিদেশী কোম্পানীর লড়াইয়ে নিছক স্বদেশীয়ানার জন্যে অংশ গ্রহণ নয়—জলপথ যাত্রায় মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন বিদেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে মুখর হওয়াই ছিল স্বপক্ষতার পক্ষে একমাত্র যুক্তি। নানান স্থানীয় সমস্যার সঙ্গে জড়িত শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক কাহিনীই সমসাময়িক জীবনীকাররা চিত্রিত করেছেন, কিন্তু সামতাবেড়ের বসতবাড়ীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত রূপনারায়ণের বুকে বিলেতী জাহাজ কোম্পানীর যে দৌরাত্ম্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তারই প্রতিবাদে যে তিনি একদা মুখর হয়ে উঠেছিলেন—এ ঘটনা অনেকেরই অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

বিলেতী-স্বদেশী দুটি জাহাজ কোম্পানীর দ্বন্দ্ব-প্রসঙ্গে আসতে হলে এর পুরানো পটভূমিকার উন্মোচন করা দরকার। তখনকার কালে কলকাতা

থেকে মেদিনীপুরের ঘাঁটাল যেতে হলে কোলকাতার আরমানী ঘাট থেকে ষ্টীমারে গেঁওখালি হয়ে ঘুরে রূপনারায়ণ দিয়ে ঘাঁটাল-বন্দরের কাছে শীলাবতীর উপর দিয়ে ঘাঁটাল শহরে পৌঁছানো যেত। পরবর্তী সময়ে এই শতকের প্রারম্ভে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ চালু হওয়ায় এতটা ঘুর-পথ পরিহার করার জন্মে কোলাঘাট স্টেশনে নেমে ষ্টীমার ধরে ঘাঁটাল যাওয়াই ছিল একান্ত সুবিধাজনক। কোলাঘাট-ঘাঁটাল এই জলপথে জাহাজ চলত 'হোরমিলার কোম্পানী' পরিচালিত 'ক্যালকাটা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী'র এবং ঘাঁটালের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 'ঘাঁটাল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী'র—যেটিকে সকলে বলতেন 'স্বদেশী কোম্পানী'। যাত্রী পৌঁছে দেবার ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই জাহাজ কোম্পানীর মধ্যে তাই রেষারেষি বেঁধে উঠেছিল যাত্রী বোঝাই নিয়ে।

ইতিমধ্যে এ রেষারেষি এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল যে, এই দুই জাহাজ কোম্পানীর দ্বন্দ্বে ঘাঁটাল থানার বড় দারোগাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। বিদেশী ক্যালকাটা নেভিগেশন কোম্পানী যেখানে খুশী জাহাজ দাঁড় করিয়ে নৌকো থেকে প্যাসেঞ্জার তুলে নিত যা ছিল একান্তই নিয়ম-বিরুদ্ধ। শুধু তাই নয় স্বদেশী ঘাঁটাল কোম্পানীর নৌকা ডাঙ্গা থেকে যাত্রী নিয়ে যখন তাদের ষ্টীমারের দিকে এগিয়ে যেতো, তখন ক্যালকাটা নেভিগেশনের ষ্টীমার এমন ভাবে পাশ কাটিয়ে ঢেউ তুলে যেত, যার ফলে স্বদেশী কোম্পানীর যাত্রী বোঝাই নৌকো ঢেউয়ের ধাক্কায় টালমাটাল হয়ে উঠে যাত্রীদের ভীষণ অসুবিধে ঘটাত। ঘাঁটাল থানার দারোগার রিপোর্টে ঘাঁটালের মহকুমা শাসক তাই ভারতীয় কার্যবিধির ১৩৩ ধারা দু'পক্ষের উপর প্রয়োগ করে এই সব নিয়মবিরুদ্ধ কাজের জন্য কৈফিয়ৎ চেয়ে নোটিশ জারী করেন। ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাস নাগাদ ক্যালকাটা নেভিগেশন কোম্পানী ঘাঁটাল মহকুমা শাসকের এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যথারীতি এক মোকদ্দমা দায়ের করে এবং ইংরেজের রাজত্বে, মামলায় তদ্বিরের কল্যাণে অবশেষে এই বিদেশী কোম্পানীর পক্ষেই মামলার রায় হয়। এই ঘটনার পরেই ক্যালকাটা নেভিগেশন তাদের স্বেচ্ছাচারের মাত্রা আবার বাড়িয়ে দেয় যার ফলে স্বদেশী কোম্পানী বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

একে সে সময় ব্রিটিশ রাজত্ব ; তার উপরে ইংরেজি তিরিশ সালে

মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পটভূমিকায় সরকারী কর্তৃপক্ষ স্বদেশীয়ালাদের প্রতি ছিলেন একান্তই বিরাগভাজন। সুতরাং এক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে এমন একটি গেঁয়ো-দিশী কোম্পানী তাদের সীমিত সম্বল নিয়ে পেরে উঠছিল না। কিন্তু, তা হলেও, তারা যে উত্তরোত্তর জনসমর্থন লাভ করে চলেছিল, তার প্রমাণ হল বিদেশী কোম্পানীর নানান প্রলোভন সত্ত্বেও এই কোম্পানীর যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি। কিন্তু বৃদ্ধির উপযোগী তাদের ষ্টীমারের বহনক্ষমতা তেমন ছিল না বলেই বেশ কিছু অসুবিধা দেখা দেয়।

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীর পাশেই ছিল একটি ষ্টীমার-স্টেশন—যেটি পানিত্রাস স্টেশন নামে পরিচিত ছিল। এখানে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ষ্টীমার দাঁড়াত সেখান থেকে ষ্টীমারওযালাদের নিযুক্ত ঠিকেদারের নৌকায় যাত্রীদের তুলে দেওয়া হলে তাঁদের তীরে পৌছে দেওয়া হত। শরৎচন্দ্রও কোলাঘাটে নেমে অনেকসময় এই জলপথে এসেছেন। এছাড়াও, এখানের এই ষ্টীমারঘাটে যাবার চালু রাস্তাটিও ছিল শরৎচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখ দিযে। তাই তিনি যাত্রীদের সুবিধে-অসুবিধে সম্পর্কে একদিকে যেমন ওযাকিবহাল ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে গমনরত যাত্রীরা বিলেতী কোম্পানীর নানান গাফিলতী সম্পর্কে প্রায়ই নানান অভিযোগ জানিয়ে যেতেন। স্বভাবতই বিদেশী কোম্পানীর অত্যাচারে এই দেশীয কোম্পানীর উপর ধীরে ধীরে তাঁর একটা সহানুভূতি গড়ে উঠেছিলো।

ইতিমধ্যেই ঘাঁটাল নেভিগেশন কোম্পানীর লোকজনদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে এবং এই কোম্পানীর ম্যানেজার বিপিনবাবুও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলে শরৎচন্দ্র তাঁর আনুকূল্য দিয়েছিলেন একান্তভাবেই। ক্রমশঃ এদের সঙ্গে তিনি এমন ঘনিষ্ঠ হযে পড়েছিলেন যে, স্বদেশী কোম্পানীর ষ্টীমার প্রত্যহ তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি পৌছবার সময় 'হুইসল' দিলে তিনি প্রায়ই তাঁর বাড়ীর দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়া দিতেন। এর ফলে, এমন একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক যে সত্যিকারের এই ষ্টীমার কোম্পানীর একজন শুভানুধ্যায়ী—তেমন ধারণা করা যাত্রীদের পক্ষে কষ্টকর হত না।

স্বদেশী কোম্পানীর প্রতি শরৎচন্দ্রের এহেন সহানুভূতি ক্রমেই বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর চক্ষশূল হয়ে উঠলো। তাদের জাহাজের যাত্রীসংখ্যা ক্রমাগত কমে যাওয়ায় তাঁরা একদিকে যেমন শরৎচন্দ্রের উপর রুষ্ট হ'ল, অন্যদিকে কিভাবে তাঁকে জব্দ করা যায় তার ফন্দি আঁটা চলতে লাগল। ঠিক এই সময়েই ঘটলো এক মারাত্মক দুর্ঘটনা।

দুর্ভাগ্যক্রমে সে ঘটনার শিকার হয় ঘাঁটাল নেভিগেশন কোম্পানী। ১৯৩২ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায়, এই দুর্ঘটনা সম্পর্কিত মামলার সংবাদে সরকার-পক্ষের বক্তব্য ছিল, ১৯৩১-এর ১৫ই অক্টোবর কোলাঘাট থেকে ক্যালকাটা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর ষ্টীমার 'অম্বা' ছাড়ার পর ঘাঁটাল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর লঞ্চ 'লীলাবতী' ছাড়ে। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর 'অম্বা'র পিছনে যে ষ্টীমারের ঢেউ উঠে, সেই ঢেউ 'লীলাবতী'র অগ্রসরে বাধার সৃষ্টি করছিল। তাই 'লীলাবতী' পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করায় কোলাঘাটের অপর পারে নাউপালার কাছে এক চড়াতে আটকে যেয়ে কাত হয়ে পড়ে। যাত্রীরা এর ফলে আতঙ্কিত হযে একপাশে ভীড় করায় লঞ্চটি উল্টে যায়—ফলে দু ব্যক্তি মারা পড়েন।

'লীলাবতী'র সারেঙ, ঠিক মত লঞ্চ চালিযেছিল কিনা—সে বিষয়টি এই প্রসঙ্গে আলোচনার বস্তু নয়। কিন্তু আদালতে নিহতদের দাবীদাররা যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ কোম্পানী প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্যে এই সুযোগে শরৎচন্দ্রকে লোক সমক্ষে হেয় করার এক ষড়যন্ত্র এঁটেছিলেন। যেহেতু শরৎচন্দ্র যে ঘাঁটাল কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতিশীল, সে কোম্পানী যে কতখানি অযোগ্য, তা সাক্ষীদের মুখ দিয়ে বলাবার জন্যে হোরমিলার কোম্পানীর গোপন হাত কাজ করেছিল। দেখা যায়, সাক্ষীরা তাদের এজাহারে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই কথাটির উপরই জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর কাছে নদীর ধারের চড়া থেকে জলমগ্নদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সাক্ষীরা কিন্তু কেউই উল্লেখ করছে না যে, পানিত্রাসের বা গোবিন্দপুরের চড়াতে পাওয়া গেছে এবং যা বললে হয়ত বোঝা যেত যে তাদের এজাহার নিরপেক্ষসম্মত। কিন্তু তা করলে তো আর শরৎচন্দ্রকে ছোট করা যায় না। সুতরাং এ থেকেই

বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে, এইসব সাক্ষীদের পিছনে কাদের কালোহাত কাজ করেছিল।

অন্যদিকে ঘাঁটাল নেভিগেশন কোম্পানীর তরফে এই সব সাক্ষীদের জেরা করা হয়েছিল এই বলে যে, 'একটা স্বদেশী কোম্পানীর দোষ-ত্রুটি খুঁজে দেখানোই ত হ'ল আপনার সাক্ষী দেওয়ার উদ্দেশ্য।' তদন্ত কমিশন অবশ্য এই ধরনের প্রশ্নে খুশী হতে পারেননি—তাই সাক্ষীকে এই প্রশ্নের জবাব থেকে রেহাই করে দেওয়া হয়।

অবশেষে এই লঞ্চ ডুবির মামলায় শেষপর্যন্ত কি হয়েছিল—তা জানা যায়নি। কিন্তু হোরমিলার কোম্পানীর উপর শরৎচন্দ্রের বিক্ষোভ যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, সে সম্পর্কে তাঁরই মুসাবিদা-করা পরবর্তী সময়ের একটা চিঠিতেই বিষয়টি প্রমাণিত হতে পারে। শরৎচন্দ্রের মুসাবিদা করা এ চিঠিটি শরৎচন্দ্রের নিজের মনোগ্রাম করা 'লেটার-প্যাডে পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের বকলমে লেখা। (পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য) পরবর্তী এক সময় শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চাননবাবুর ভাই পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় এই ক্যালকাটা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর ষ্টীমার থেকে পানিত্রাসের ষ্টীমার ঘাটে নৌকায় যাত্রী অবতরণের কাজে ঠিকাদার নিযুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তারজন্যে এই কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিপত্র বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা চেযে ঐ কোম্পানীর ট্রাফিক-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে যে পত্র দিযেছিলেন—তার মধ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অনেক ঝাঁঝালো অভিযোগই আনা হযেছিল। বেশ বোঝা যায, শরৎচন্দ্র এ মুসাবিদা না করলে এই বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ জানিযে এমন কোন কথা হয়ত লেখা হত না।

এইসব ঘটনায় ঘাঁটাল কোম্পানী অবশ্য হতোদ্যম হয়ে পড়েনি। বিলেতী কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন একটা বড় ধরণের জাহাজ কেনার এবং এ উদ্দেশ্যে মূলধন সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়। বলা বাহুল্য, মূলধন সংগ্রহের বিষয়ে শরৎচন্দ্র শুধু মৌখিক সহযোগিতার হস্তই প্রসারিত করেন নি—একাজে তিনি এক অগ্রণী ভূমিকাও নিয়েছিলেন।

ঘাঁটাল নেভিগেশন কোম্পানীর বড় ষ্টীমার কেনার পরিকল্পনায় তিনি যে বেশ কিছু শেয়ার ক্রয় করেছিলেন—একথা ঘাঁটাল-বাসীদের কাছ থেকে জানা

গেছে। শুধু নিজেরই শেয়ার ক্রয় নয়—দেশবাসীও যাতে এই বেসরকারী উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন, সেজন্যে তিনি নিজে একটি আবেদনপত্র রচনা করে সংবাদপত্রে মুদ্রণের জন্যে প্রেরণ করেন। যেহেতু এটি একটি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের আবেদনপত্র, তাই অন্য কোন সংবাদপত্র শরৎচন্দ্রের এই আবেদনটি প্রকাশ করেনি। একমাত্র 'বঙ্গবাণী' পত্রিকাতেই এই আবেদনপত্রটি ছাপা হয়েছিল। বলা যেতে পারে, এ আবেদনপত্রটি শরৎচন্দ্রের এক অপ্রকাশিত রচনা। তাঁর স্বরচিত এই আবেদনপত্রের মধ্যেই সে সময়ের জাহাজ কোম্পানীর দ্বন্দ্ব-রেষারেষির পটভূমিকায় স্বদেশী কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের যুক্তিগুলি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ১৯৩১ সালের ২৩ শে মার্চ 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের সেই আবেদনপত্রটি এই সঙ্গে দেওয়া গেল :

"দি ঘাটাল ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবেদন

বঙ্গবাণী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, রূপনারায়ণ নদীর ধারে পানিত্রাসে আমার বাড়ীর পাশ দিয়া ঘাঁটাল ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ষ্টীমার ও লঞ্চ চলে; কোলাঘাট হইতে ঘাটাল পর্যন্ত ইহাদের যাতায়াত। হোরমিলার কোম্পানীও এই লাইনে তাহাদের ষ্টীমার চালায়। গত ছয় বৎসরকাল এই দুইটি কোম্পানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমার বড়, অথচ কম জলে চলিতে পারে; সুতরাং সারাবৎসর তাহাদের চলায় বাধা হয় না। এছাড়া তাহাদের অর্থের অভাব নাই; ফলে ভাড়া কমাইয়া যাত্রীদের সিগারেট উপহার দিয়া, একতালা ও দোতালার ভাড়া সমান করিয়া অধিক সংখ্যক ষ্টীমার দিয়া তাহারা দেশী কোম্পানীর পক্ষে প্রতিযোগিতা কঠোর ও নিদারুণ করিয়া তুলিয়াচে। দেশী কোম্পানীর ষ্টীমার ছোট, জল ভাঙ্গে বেশী, সেইজন্য সারাবৎসর সকল সময় চলিতে পারে না। তথাপি এতপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও দেশী কোম্পানীর ষ্টীমারে লোক যথেষ্ট হয়। ইহার বড় একটা কারণ এই যে, যাত্রীগণের অধিকাংশই এই স্বদেশী "ঘাটাল কোম্পানীর" অংশীদার এবং প্রায় সমস্ত দেশের লোকই এখন দেশী কোম্পানীকে নানাভাবে সাহায্য করিতে চায়—এই সকল কারণে এবং ঘাটাল কোম্পানীর

ডিরেক্টরদের কর্মপটুতা, সততা ও নিঃস্বার্থতার জন্য এই ধনী, বিদেশী ও শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত লড়াই করিয়া, প্রতি বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও দেশী কোম্পানীটি এখনও টিকিয়া আছে।

এই দেশী কোম্পানীটিকে এই অসম প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া তোলা দেশের লোকের একান্ত কর্তব্য। বহুদিন হইতে ইহার সকল দিক দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি যে, যাতায়াতের যথেষ্ট ও নিয়মিত সুবিধা দিতে পারিলেই যাত্রীরা দেশের বর্তমান অবস্থায় বিদেশী কোম্পানীকে ছাড়িয়া দেশী কোম্পানীরই পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। ইহার জন্য প্রয়োজন হোরমিলার কোম্পানীর শীতলার মত একখানি বড় ষ্টীমার।

ইতিপূর্বে ঘাটালের বিশিষ্ট উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, মহাজন প্রভৃতি কোম্পানীর পরিচালকগণ নিজেদের এবং এগার শত যাত্রীর মধ্যে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা তুলিয়া দুইটি ছোট ষ্টীমার ও একটি মোটর লঞ্চ ক্রয় করিয়া আজ ছয় বৎসর এই লড়াই চালাইতেছেন। তাহার উপর বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ে ঘাটালের জনসাধারণের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে সেখান হইতে আরও বেশী সংখ্যক অংশীদার পাওয়ার আশা করা বর্তমানে শুধু অন্যায় নহে, নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা। সেইজন্য আমি আজ এই আবেদন লইয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

কোম্পানীটি এবং কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপ ঘাটালের স্থানীয় ব্যাপার হইলেও, সমস্যাটি স্থানীয় নহে সার্বজনীন। দেশী কোম্পানী বনাম বিদেশী কোম্পানী ইহাই হইল আসল সমস্যা। একটি দেশী বাঙ্গালী কোম্পানীকে বাঁচাইয়া তুলিয়া লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করা বাঙ্গালীর শুধুই কর্তব্য নয়, গৌরবের বিষয়। আশা করি, এই স্বাদেশিকতার ক্ষেত্র হইতে সমস্যাটিকে দেখিয়া দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ ও ধনীগণ এই কোম্পানীকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন। শুধু সাহায্য ভিক্ষা দিয়া নয়,—ব্যবসায়ে অংশীদার হইয়া যে সাহায্য দেওয়া যায় তাহাই আমরা চাই। অথচ একথা প্রকাশ করা প্রয়োজন যে, এই অসম প্রতিযোগিতায় হয়ত অনেকদিন পর্যন্তই দেশী ষ্টীমার কোম্পানী লাভবান হইতে সমর্থ হইবে না। তথাপি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, একটি বড় ষ্টীমার ক্রয় করিতে পারিলেই এই দেশী "ঘাটাল

কোম্পানী” অচির ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা মুক্ত হইয়া একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারিবে।

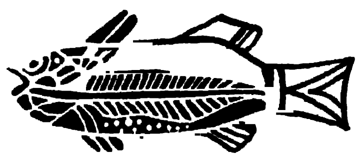
এই কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ আমার সবিশেষ পরিচিত। তাঁহাদের সহিত ভালরূপ মিশিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই কোম্পানীর কাজকে জাতীয় কাজ মনে করিয়া একান্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত বিনা পারিশ্রমিকে ইহার কর্ম পরিচালনা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায়, প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করিবার মত সাহায্য ও সুবিধা পাইবামাত্রই এই দেশী কোম্পানী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সর্বাপেক্ষা আশা ও আনন্দের কথা এই যে, ইহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী গ্রাজুয়েট নন্, কলকব্জা সম্বন্ধে তাঁহার হাতেকলমে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাও প্রচুর পরিমাণে আছে। তিনি নিজ হাতে ষ্টীমার চালানো শিক্ষা করিয়া পোর্ট অফিসে সারেঙের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এবং গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ষ্টীমারের যাবতীয় কলকব্জা কোনো ডকে না দিয়াও গভর্ণমেণ্ট সারভেয়ারের অনুমোদনে নিজেই মেরামত করিয়া চালাইতেছেন। কলকব্জাঘটিত ব্যক্তিগত জ্ঞানের অভাবে বহুস্থানে এইরূপ কোম্পানীর যে ক্ষতি হয়, বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহার আশঙ্কা নাই। প্রয়োজনীয় মূলধন পাইলে এরূপ সুদক্ষ ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে এই কোম্পানীর ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, দেশের কল্যাণকামী জনগণের নিকট আমার এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না। ইতি—
৩০শে ফাল্গুন ১৩৩৭।”

শরৎচন্দ্রের এই আবেদনের উত্তরে দেশবাসী কতখানি এবং কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন—সে সম্পর্কে কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। ঘাঁটাল-কোলাঘাট ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, ঘাঁটাল নেভিগেশন কোম্পানী কিন্তু একেবারে উঠে যায়নি। এখনও এই কোম্পানী কোলকায় বাঁধাঘাট—নিমতলা ঘাটে পারাপারের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

কালের বিবর্তনে আজ আর ঘাঁটাল যাওয়াতে এই জলপথ ব্যবহৃত হয় না। কোলাঘাটের কাছে জাতীয় সড়কের উপর সেতুটি জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে সরকার ‘শরৎ-সেতু’ হিসাবে নামকরণ করেছেন। রূপ-

নারায়ণের বুকে এখন স্থানে স্থানে চড়া পড়েছে—জলপথ যাত্রায় কোলাঘাটের জাহাজ-ঘাটার ইতি হয়ে গেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই নদ এবং সেই ষ্টীমার কোম্পানীর সম্পর্ক এখনও প্রবীণদের মুখে মুখে শোনা যায় গল্পের মত। আর তখনই মনে হয়, সামতাবেড়েতে বসবাসকালে একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসেবী হিসেবে নিজের জীবনটাকে শুধুমাত্র তিনি উপভোগ করেন নি; অথবা স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন থেকে শুধু কাগজ কলম নিয়ে সৌখীন মজদুরি' করেন নি। তাঁর জীবনের এমন অনেক ঘটনার মধ্যে দুই ষ্টীমার কোম্পানীর এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার আখ্যানটি হল এমন একটি সংযোজন। তাই তিনি সত্যিকারের এক দরদী কথাসাহিত্যিক—যা সমগ্র সাহিত্যিক জীবন-ইতিহাসে একান্তই দুর্লভ।



শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা

শরৎচন্দ্রের জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন খেয়ালী, ভবঘুরে আর দরদী। শুধু দুটো চোখ দিয়ে নয়—তাঁর মন দিয়ে তিনি বিশেষ করে দেখেছেন এই সমাজের নীচুতলার লোকদের। তাদের অসহায় জীবনের সন্ধান নেবার জন্যে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন, নগরে-শহরে-গ্রামে-গ্রামান্তরে; তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ আর ব্যথা-বেদনার অভিজ্ঞতাকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়; এইসব নিপীড়িত ও লাঞ্ছিতদের সমাজে তাঁর এই মানব-চিন্তার আদর্শই হলো মানবতাবাদ। 'অপার্থিব থেকে পার্থিবের প্রতি, স্বর্গলোকের দেবতা থেকে মর্ত্যলোকের মানুষের প্রতি, অদৃশ্য অলৌকিক জগৎ থেকে দৃশ্যমান বহির্জগতের প্রতি মানুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করাই হোল হিউম্যানিস্ট-এর আদর্শ'। মনে হয় এই আদর্শবোধের চেতনাই শরৎচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করেছে সেই সব অবহেলিতদের বিষাদময় জীবনের রূপায়ণে। তাই তাঁর মানবচেতনায় যে সহজ সত্যটি ধরা পড়েছে—তা হোল মানুষকে আগে মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যিকের ওপরে সত্যিকারের একজন মানবপ্রেমিক।

এখন প্রশ্ন হোল, সাহিত্যিকের লেখনীর মধ্যে মানবচেতনার একতারায় ওই যে মেঠো সুরটি বেজে উঠেছে—তার মূলে এই মানবধর্মের উপর বিশ্বাস ছাড়া তথাকথিত ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যাদির প্রভাব কতটা ছিল ও তাঁর এই ধর্মবিশ্বাসের পরিধি কতদূর বিস্তৃত ছিল? শরৎচন্দ্রের জীবনের এই প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল এবং এটি একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় হলেও, সামাজিক জীবনে

এর প্রতিফলনের কথা চিন্তা করে এর সামাজিক গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিচরিত্র ও সাহিত্য-বিশ্লেষণ করে তাঁর জীবন-চরিতকাররা তাঁকে ঈশ্বরবিশ্বাসী—পরম ধর্মনিষ্ঠ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের চোখে, 'তাঁর অন্তরে ফল্গুধারার মতই ঈশ্বর-ভক্তির একটা গোপন স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হত। তিনি ছিলেন সত্যকারের একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষ।'[১]

শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা সম্পর্কে আর একজন সমালোচক তাঁর সমগ্র সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শরৎচন্দ্র ধার্মিক ছিলেন, ভগবৎ-বিশ্বাসী ছিলেন।[২]

শরৎ সাহিত্যের নাযক-নায়িকাদের ভগবদ্‌ভক্তি উপলক্ষ্য করেই সমালোচকরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন যে, লেখকের কাজ শুধু উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করে তা যথার্থ ফুটিয়ে তোলা নয়, সেই চিত্তবৃত্তিকে স্বধর্মে স্থাপন করাও লেখকের একটা মস্ত কাজ। সুতরাং উপন্যাসে নায়ক-নায়িকাদের মুখে ভগবানের যে জয়গান ধ্বনিত হয়েছে—তা শরৎচন্দ্রের ধর্মচিন্তারই প্রতিচ্ছবি। শুধু তাই নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দু-একটি খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ তুলে সমালোচকরা তাঁর আস্তিক্যবাদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন।

এ সম্পর্কে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎ-সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে, যে আলোকপাত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, 'প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, শিল্পীর সৃষ্ট চরিত্রগুলি থেকে কি আমরা শিল্পীর মনের অনুরাগের কিম্বা বিরাগের কোন হদিশই পাই না? একটি মানুষকে আঁকতে গিয়ে শিল্পী কি তার নিজের মনের মতবাদের রঙ্‌ মাখিয়ে দেন না তার সৃষ্টিতে? আমার মতে যিনি যথার্থ রসস্রষ্টা, খাঁটি শিল্পী, তিনি তা করেন না। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে নানা চরিত্র সৃষ্টি করেন আর সেই চরিত্রগুলির প্রত্যেকটির মুখ দিয়ে তিনি নানা কথা

১ গোপালচন্দ্র রায়—শরৎচন্দ্র (১ম)-পৃঃ ৪৪২

২ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায—শরৎ চেতনা, পৃঃ ২০৩

বলান, এমন কি পরস্পরবিরুদ্ধ কথাও বলান। সেই কথাগুলি কিন্তু সাহিত্যস্রষ্টার মতামতের উদাহরণ হতে পারে না—যিনি যথার্থ শিল্পী তিনি তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রকে তার পূর্ণ মর্যাদা দেন সেই চরিত্রের সমস্ত রস ও রং ফুটিয়ে তুলে।'

লেখকের সামাজিক মতামতের প্রতিফলন কি তার সাহিত্যের মধ্যে প্রভাবিত হয় না—এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা, 'তবে কি ঔপন্যাসিকের সামাজিক মতামত একেবারেই ধরা পড়ে না তাঁর সৃষ্টিতে; আমাদের মতে ধরা পড়ে, কিন্তু সেটি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির জবানীতে তিনি যে সব মতামত প্রকাশ করেন—তার থেকে ধরা পড়ে না। উপন্যাসের চরিত্রগুলির নানা ক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় এনে দাঁড় করালেন, তাদের কোন্ জিনিষটা দেখালেন, তার থেকে প্রমান পাওয়া যায় লেখকের মতের। তার থেকে আমরা বুঝতে পারি, জীবনের বহু প্রচলিত রীতির মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করেছেন সাহিত্যিক, সামাজিক বিধানের কোনটিকে তিনি মানলেন, কোনটিকেই বা বর্জন করলেন।'[১]

সুতরাং শরৎ-সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে যেয়ে, তাদের মতামতগুলিকে নির্বিচারে লেখকের মতামত বলে ধরে না নিয়ে বিচার করলে, আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, শরৎচন্দ্র তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে ভগবৎ-অনুভূতি অপেক্ষা নীতি ও সত্তা বিবর্জিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন; ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মুখর হয়েছেন এবং ভগবানের মহিমাকীর্তন থেকে বিরত থেকেছেন। এর জন্যেই অনেক সময় 'ধর্মদ্রোহী' বা 'সমাজদ্রোহী' হিসেবে শরৎচন্দ্রকে আখ্যা পেতে হয়েছে। অথচ শরৎচন্দ্রের রচনার মূল সুরটি হোল সত্য-ন্যায় ও মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ধর্মবোধ—নিছক ঈশ্বরাশ্রিত নয়।

অপর দিকে শরৎচন্দ্রের জীবনীকাররা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী তুলে ধরে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে যে তথ্যই উপস্থাপিত করুন না কেন—

১ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ, পৃঃ ৪

প্রচলিত ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর লেখা চিঠিপত্র ও লিখিত বক্তব্যগুলির আলোচনায় এলে এই ধারণার সম্পূর্ণ নিরসন হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এ সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়কে লেখা এক পত্রে শরৎচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন, "...আমাদের বংশের একটা ইতিহাস আছে। এই বংশে আমার মেজভাই (প্রভাস) ৺ স্বামী বেদানন্দকে নিয়ে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়া চললো—কেবল আমিই হলাম একেবারে ঘোরতর নাস্তিক। 'হেরিডিটি' আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধরলে।" যিনি সমাজের প্রচলিত অন্যায় অবিচারমূলক রীতিনীতির বিরুদ্ধে সমাধানের পন্থা হিসেবে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে বলতে পেরেছিলেন, 'Social reform বা Construction আমার কাজ নয—' তিনি হঠাৎই নিজেকে নাস্তিক বলে প্রকাশ করতে চান নি। বাইরের ভাবখানা যাই থাকুক—অন্তরে যে তিনি নাস্তিকতাবাদী ছিলেন—তা ঐ ব্যক্তিগত পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে বলেই জানতে পারা গেছে।

অপরদিকে, যোগসাধনার ও সাধনভজনের মধ্যে মানবজীবনের পরলোকলাভ ইত্যাদির বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি তাঁর স্পষ্ট ধারণা রেখে গেছেন। তিনি ইহলোক ও ইহলোকের রক্ত-মাংসের দেহকেই বিশ্বাস করতেন—পরলোক স্বীকার করতেন না। চন্দননগরের এক আলাপ-আলোচনা সভায় এ সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে,..."এই দেশটাকে তিনি (মতিলাল রায়—'প্রবর্তক' সংঘের প্রতিষ্ঠাতা) আবার পুরাতন ধর্মের উপর দাঁড় করাতে চান—নূতন জাত গড়তে চান, কিন্তু basis হল ধর্ম—ভগবদ্ভক্তি—এই সমস্ত। শাস্ত্রে-টাস্ত্রে অনেক সাধনার কথা আছে—আমার unfortunately মনটা একেবারে উল্টোদিকে গেছে—সাধনার আর কোন মূল্য খুঁজে পাই না। শাস্ত্র-সাধনা যা ছিল, সবই যদি এতবড় ছিল, আমরা এত ছোট হলুম কেন?"[১]

এ থেকেও দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র পরকালের সুকৃতির জন্যে ধর্মসাধনা ও

১ শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃঃ ২৪২

সাধন-ভজনকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং কেন গ্রহণ করেন নি, তাও মোটামুটি বলে দিতে পেরেছেন। এ সম্পর্কে আরও একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে। প্রবর্তক সংঘের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে আশ্রমের জয়গান করার জন্যে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র সে অনুরোধ রাখতে পারেন নি বলে, তাঁকে পরবর্তী বৎসরে তাঁদের আলোচনা সভায় নিমন্ত্রণ করা হয়নি। এ সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে তিনি লেখেন, 'তাঁরা অনুরোধ করেছিল, বইয়ের (শেষ প্রশ্ন) মধ্যে শেষের দিকে যেন আশ্রমের জয়গান করতে পারি। অথচ, স্পষ্ট দেখা গেল, পেরে উঠিনি।' সুতরাং এখানে শরৎচন্দ্র যে এইসব শাস্ত্র-সাধনার মূল্য দিতে অপারগ হয়েছেন—তাতে তাঁর ধর্মচেতনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি, শরৎচন্দ্রের স্বহস্ত-লিখিত অপ্রকাশিত কয়েক লাইন বক্তব্য পাওয়া গেছে—যার বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের ধারণা সম্বন্ধে উপলব্ধি করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের এই অপ্রকাশিত বক্তব্যটি যে বইয়ের পাতায় লেখা আছে—তা বর্তমানে পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ইংরেজী ১৯৩০ সালে প্রবর্তক সংঘ প্রকাশিত মতিলাল রায় মহাশয়ের রচিত শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের 'দাম্পত্য জীবন' নামক পুস্তকখানি প্রবর্তক সংঘের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হয়। উপহার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে যা লেখা হয়, তা হল : শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে অর্পিত হইল। প্রবর্তক সংঘ, চন্দননগর, ২৩. ৩. ৩০। এই পুস্তকটি পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র পুস্তকটির পাঠ শেষ করে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত অনেক বইয়ের মধ্যে বইখানাকে রেখে দিয়ে যথাকর্তব্য পালন করতে পারতেন। কিন্তু বইটি পাওয়ার পর তাঁর মনে ঈশ্বরবিশ্বাস ও সাধনভজন সম্পর্কে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাই তিনি বইটি প্রাপ্তি মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে একটা সিদ্ধান্ত করেন।

শরৎচন্দ্র এই উপহার প্রাপ্ত পুস্তকখানি স্থানীয় দুজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন। উপহার পৃষ্ঠায় তাঁর উপহৃত বক্তব্যের পাশেই তিনি আবার উপহার দিলেন এই কথা লিখে :

'স্বধর্মনিষ্ঠ, পরম ভাগবত, ধার্মিক শিরোমণি
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়[১]

বইখানি বহু ক্লেশে পড়িয়া শেষ করিলাম। পরলোকগত রামকৃষ্ণের সাধনভজন, সাধনার পদ্ধতি, সিদ্ধি ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের বহুবিধ তত্ত্ব-নিরূপণ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত ও ব্যক্ত করার কঠোর প্রযত্ন আছে। এই সকল উচ্চাঙ্গের ব্যাপার। আমার মত ব্যক্তির একান্ত দুরধিগম্য। বোঝা অসম্ভব। অতএব, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ও পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় ভক্ত ও মহাধর্মশীল ব্যক্তিদের দিলাম। তাঁরা সমস্ত ব্যাপার যে জলের মত বুঝিতে পারিবেন—এ বিষয়ে আমার লেশমাত্র সংশয় নাই।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

আলোচ্য পুস্তকটির উৎসর্গ-পত্রে তিনি যা লিখেছেন, তার মধ্যেই শরৎচন্দ্রের ধর্মের প্রতি মনোভাবটি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। তাই প্রচলিত ধারায় ধর্মের ও আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধতা না করে তিনি শ্লেষভরে লিখেছিলেন, 'বইখানি বহু ক্লেশে পড়িয়া শেষ করিলাম', বোঝা অসম্ভব' বা 'তাঁরা সমস্ত ব্যাপার জলের মত বুঝিতে পারিবেন'—ইত্যাদি। এগুলি ধর্ম ও সাধনভজনের প্রতি আস্থাসূচক বাক্য নয়; স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোয় বিচার করে বলা যেতে পারে এগুলি ব্যঙ্গোক্তি।

উপরন্তু, যাঁদের কাছে তিনি বইখানি উপহার দিলেন, তাঁদের কাছেও শরৎচন্দ্র নিজের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার কথা তুলে ধরলেন না। এখানে বেশ বোঝা যাচ্ছে, তিনি নিতান্তই লোকাচারের দাস হয়ে পড়েছেন এবং পরবর্তী প্রসঙ্গটি আলোচনা করলে তাঁর চরিত্রের এই দ্বৈত ভূমিকাটি সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া যেতে পারে।

সামতাবেড়ের বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে যে সব পুস্তকাদি

১ রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন এবং পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা।

সংগৃহীত আছে, তার মধ্যে পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় কোথাও তিনি বই পড়ে শেষ করেছেন—এমন ঘোষণা লিখিতভাবে ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধুমাত্র এই পুস্তকটির ক্ষেত্রে। পুস্তকটির শেষ ১৩৯ পৃষ্ঠার এক কোণে তিনি লিখেছেন—'পড়িয়া শেষ করিলাম। শরৎ ১২ চৈত্র ১৩৩৬।'

এখন প্রশ্ন হোল, আসলে তিনি বইখানি আদৌ পড়েছিলেন কিনা? বই পড়া শেষ হলে সমস্ত বইয়ের পাতাতে তিনি ঐ ঘোষণা লিখে রাখবেন—এটাই হ'ত তাঁর পঠন-পাঠনের রীতি। কিন্তু এক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমই এই চিন্তার সুযোগ করে দেয় যে, আসলে তিনি 'বহু ক্লেশে পড়িয়া' পুস্তকখানি শেষ করেন নি। যাঁদের বইটা উৎসর্গ করেছেন—তাঁদের কাছে তিনি বই না পড়ার অভিযোগ থেকে মুক্ত হবার জন্যে বইযের শেষ পৃষ্ঠায় তাঁর বই পড়ে শেষ করার ঘোষণাটি লিখে রেখেছিলেন। বেশ বোঝা যায়, তাঁর মন সমাজের প্রচলিত সংস্কারের বেড়া ভেঙ্গে বের হতে পারেনি। তবুও একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ধর্মবিষয়ে প্রকাশ্যে কোন আলোচনা না করলেও তিনি চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরলাভে সাধনভজনের পরিপন্থী ছিলেন।

পরবর্তীকালে ১৯৩২ সাল নাগাদ কাশিমবাজারের শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকেও শরৎচন্দ্র যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও শরৎচন্দ্রের ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। তিনি ঐ চিঠিতে লিখেছিলেন: 'তোমার পদ্মরাগ কবিতার বইখানি আগাগোড়া মন দিয়ে পড়েছি, তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত মানুষ, তোমার সকল অনুভূতি আমি গ্রহণ করিতে পারি সে সাধ্য আমার নেই, তবুও প্রেমের তীর্থ পড়লে চোখে জল আসে।'

সম্প্রতি, শরৎচন্দ্রের আরও এক অপ্রকাশিত রচনার সামান্য অংশ পাওয়া গেছে। এটি শরৎচন্দ্র কোন্ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন তা জানা যায়নি, তবে এই লেখার মধ্যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্‌বিশ্বাসকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করতে পারেন নি। সমালোচনা করে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ঈশ্বর বিশ্বাসী জগতে কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। এই পরম ভাগবত কবির স্বহস্ত Political যুক্তি তর্ক ভগবানের রুদ্ধদ্বারে এসে আছাড় খেয়ে পড়ে। তাঁর একান্ত বিশ্বাস বিধাতার কল্যাণ হস্তই সব কিছু ক'রে চলেছে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা কি তা আমরা জানিনে;

তাঁর ইচ্ছার দোহাই Politics এ আসা কোন কারণেই আমার ভালো মনে হয় না।

প্রাচীনকালের দর্শনের বড বড় যুক্তিতর্ক যেমন দেবের বাণীর দরজায় এসে নিজেদের পথ হারিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোতো।

বড় বড় ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্তের দলই এযাবৎ দেশের Politics নিয়ে নাড়াচাড়া করচে। যাদের হওয়া উচিত ছিল সন্ন্যাসী, তারা হলেন Politician। তাই ভারত-politics (এ) এত বড় দুর্গতি।"[১]

ধর্মবিশ্বাসী—ঈশ্বর-বিশ্বাসী শরৎচন্দ্রের কলম থেকে এ উক্তি যে কোনদিন বেরুতে পারে না—এ সম্পর্কে নিশ্চযই দ্বিমত নেই। পরিশেষে, বলা যেতে পারে, তাঁর ধর্মচিন্তা মর্ত্য ও মানবকেন্দ্রিক হিসাবেই নিবদ্ধ ছিল, তাই বোধ হয় তিনি বলতে পেরেছেন, 'সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে।'

১ পবিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য।



শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন

'শরতের এককালীন চরকা-ভক্তি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে বারবার হেসেছি, কখনো হাসতুম না, গম্ভীর হয়ে নীরব হয়ে থাকতুম যদি আমার মনের মধ্যে লেশমাত্র কাঁটার ক্ষত থাক্‌ত।...শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন্ দ্বীপান্তরে চালান করে দিয়ে নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ ক'রে বসে আছেন—তাঁর ঠিকানা জানিনে,—তুমি নিশ্চয়ই জানো; অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিও যে সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি। তিনি চরকা ছেড়ে কলম ধরেছেন তাতে আমি খুসি হয়েছি এই জন্যে যে, তাঁর কলম থেকে দেশোন্নতির যে সূত্রপাত হবে চরকা থেকে তা হবে না—কিন্তু খেয়ালের বশে তিনি যদি চক্রধর হয়েই থাকেন তাহলেও তাঁর বিরুদ্ধে আমি কখনোই চক্রান্ত করব না।'—১৬.৪.২৬ তারিখে লেখা এ চিঠি রবীন্দ্রনাথের; লিখেছিলেন মণ্টুকে (দিলীপকুমার রায)।

শরৎচন্দ্র তখন বাজে শিবপুরের বাড়ী ছেড়ে সামতাবেড়ের বাড়ীতে এসে উঠেছেন। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছে, শরৎচন্দ্র বোধ হয় গ্রামে যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গান্ধীবাদী চরকা-রাজনীতি ছেড়ে কলম ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের চরকাভক্তি সম্পর্কে তখন রবীন্দ্রনাথের এই শ্লেষাত্মক মন্তব্যের অন্য আর এক কারণও ছিল। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার প্রশ্নে বিরুদ্ধতা করে পূর্ব ও পশ্চিমী শিক্ষার মিলনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ এবং তারই

প্রতিবাদে পশ্চিমী সভ্যতার দ্বারস্থ হয়ে বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ নয়—এই যুক্তিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন 'শিক্ষার বিরোধ প্রবন্ধ'। তাই রবীন্দ্রনাথ খেয়ালের বশীভূত 'চক্রধর'কে দেশোন্নতির পন্থা হিসেবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র তখনও হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী নিজে চরকা কেটে চলেছেন, খদ্দরও পরেন এবং অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে জেলায় কংগ্রেস কমিটি গঠনের মাধ্যমে তাঁত ও চরকা কেন্দ্র স্থাপন, বিলাতী পণ্য বর্জন এবং অসহযোগ প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে 'নন-কো-অপারেশন' আন্দোলন স্বরু হয়, বাংলায় সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। হাওড়ার বাজে-শিবপুরে থাকাকালীন দেশবন্ধুর পরামর্শমত শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলাতে কংগ্রেস সংগঠন ও অসহযোগ আন্দোলন প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণে অপারগ ব্যক্তিদের কংগ্রেস ও গান্ধীজীর অহেতুক সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি-পদে ইস্তফা দেন।[১] কিন্তু দেশবন্ধুর হস্তক্ষেপে তাঁর পদত্যাগপত্র শেষপর্যন্ত গৃহীত হয়নি এবং ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করার পর দেখা যাচ্ছে গান্ধীবাদ ও অহিংস আন্দোলনের প্রতি একান্তই শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছেন। তাই ১৯২২ সালে গান্ধীজীর কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনায় বিচলিত হয়ে তিনি লিখেছিলেন: 'যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোথাও কোন কিছু নাই, আর্তের জন্য, পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে, যাহার অপরাধে এই মানুষটিকে আজ জেলে যাইতে হইল।'[২] গান্ধীজীর কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনায় কেবল দু-চারটি ভাবপ্রবণ কথা বলেই থেমে থাকলেন না, গান্ধীজীর অনুসৃত পথে দেশবাসীর কর্তব্য সম্পর্কে একটা ইঙ্গিতও দিলেন: 'আত্ম-বঞ্চনা করিয়া নয়, পরের উপর মোহ বিস্তার করিয়া

১ দ্রঃ স্বদেশ ও সাহিত্য: আমার কথা।

২ শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী: মহাত্মাজী পৃঃ ৮৯

নয়, হিংসা ও আক্রোশের নিষ্ফল অগ্নিকাণ্ড করিয়া নয়—কারারুদ্ধ মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারি মত শুদ্ধ ও সমাহিত হইয়া এবং তাঁহারি মত লোভ, মোহ ও ভয়কে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া। অর্থহীন কারাবরণ করিয়া নয়—কারাবরোধের অধিকার অর্জ্জন করিয়া।'[১]

শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাসে সমাজ-জীবন যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, বলতে গেলে রাজনীতি কোন প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার ফলে গান্ধীবাদী রাজনীতির প্রভাবে পড়ে শরৎচন্দ্র 'জাগরণ' উপন্যাসে[২] প্রথম রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করলেন। যদিও উপন্যাসটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি, তবুও সে সময়ের অসহযোগ আন্দোলন কিভাবে জনমানসে এক গণ আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছিল—সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক নিখুঁত বিবরণ এতে চিত্রিত হয়েছে।

দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে দুটি ধারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে একটি হল নিয়মতান্ত্রিক ও অন্যটি সন্ত্রাসবাদী। নিয়মতান্ত্রিকদের উদ্দেশ্যই ছিল নির্বাচন ও ভোটের মাধ্যমে শাসনক্ষমতায় আধিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয়দের কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না—অস্ত্রবলে হিংসাত্মক পথে বিদেশী সরকারের উচ্ছেদই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। সর্বোপরি এই দুটি মতবাদের অভিভাবক হিসাবে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়ে চলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদাসম্পন্ন ভদ্রলোক সমাজ। সুতরাং তত্ত্বগতভাবে কৃষক শ্রমিকের কথা বলা হলেও, এঁদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে দেশের বৃহত্তর শোষিত সমাজের কোন স্থান ছিল না। ১৯২১ সালে ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে যখন জাতীয়তাবাদী রাজনীতি গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বৃহত্তর জনসমাজে ছড়িয়ে পড়তে সুরু হল, তখন নিয়মতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসবাদী এই দুই

১ শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী : মহাত্মাজী পৃঃ ৮৯

২ উপন্যাসটি 'মাসিক বসুমতী'তে ইংরেজি ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

দলই গান্ধী বিরোধিতায় সাহস না পেয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সামিল হলেন। এক্ষেত্রে দেশবন্ধুর সহযোগী শরৎচন্দ্র স্বভাবতই নিয়মতান্ত্রিক মতবাদের অনুরাগী হলেও সে সময়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি।

অসহযোগ আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শরৎচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আদর্শগত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন—তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অসহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে গান্ধীজী যখন ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান, তখন রবীন্দ্রনাথ বিরুদ্ধতা করে যে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ লেখেন—শরৎচন্দ্র এই আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে তারই প্রতিবাদে লেখেন 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ। সুতরাং এসময় দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র মনে প্রাণে গান্ধীবাদী রাজনীতির একজন বড়ো সমর্থক। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম পর্যায়ে বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার পূর্বভাগে, বাঁকুড়া ও কুমিল্লা জেলায় যে ব্যাপক ও প্রবল গণ আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার ফলে এইসব জেলায় সরকারী শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে এই গণ আন্দোলন প্রতিটি কংগ্রেসকর্মীর কাছে একান্তই উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। বলতে গেলে এই আন্দোলন শরৎচন্দ্রকেও যে একান্ত প্রভাবিত করেছিল তার বড় দৃষ্টান্ত হল এই 'জাগরণ' উপন্যাস। প্রজার রক্ত জমাট করা টাকায় সৃষ্ট জমিদারী অত্যাচারের পটভূমিকায় অহিংস পন্থায় অসহযোগ আন্দোলনকারীদের কারাবরণ, বিলাতী বস্ত্র বয়কট এবং সর্বোপরি খাজনা বন্ধ আন্দোলন ইত্যাদি গণ আন্দোলন সংক্রান্ত সবকিছুই এ উপন্যাসে প্রতিফলিত। শরৎচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লেখনীতে স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করলেন,'...মহাত্মাগান্ধীর নন-কো-অপারেশনের প্রচণ্ড তরঙ্গ এক মুহূর্ত্তে একেবারে অভ্রভেদী হইয়া দেখা দিল। হঠাৎ মনে হইল, এই ভয়লেশহীন শুদ্ধ শান্ত সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ তপস্যা হইতে যে 'অদ্রোহ অসহযোগ' নিমেষে বাহির হইয়া আসিল, ইহার অক্ষয় গতিবেগ প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।'[১] এ আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে যাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর জেল হয়েছে, এমন দুজন

১ অপ্রকাশিত রচনাবলী : জাগরণ, পৃঃ ১১১

ছাত্রের জেল হওয়ার কারণ সম্পর্কে খোদ জমিদারবাবুর জবানীতে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে লিখলেন : '...চারিদিকে গান্ধীর নন-কো-অপারেশন মত প্রচার ক'রে বেড়িয়েছে ; দেশের লোককে ডেকে বলেছে, কেউ তোমরা মারামারি কাটাকাটি ক'রো না, কোন ব্যক্তি বিশেষ বা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ ক'রো না. কিন্তু এই অনাচারী, ধর্মহীন, সত্যভ্রষ্ট বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক রেখো না, চাকরির লোভে এর দ্বারে যেয়ো না, বিদ্যের জন্যে এর স্কুল কলেজে ঢুকো না, বিচারের আশায় আদালতের ছায়া পর্যন্ত মাড়িও না।'[১] অসহযোগ আন্দোলনের রাজনীতি বা তার সমস্ত কার্যক্রমের এমন সুন্দর বিবরণ আর কি হতে পারে ?

এছাড়াও জাগরণ উপন্যাসে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে একদিকে যেমন আন্দোলনকারীরা হাটে বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছে অন্যদিকে জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজারা ধর্মঘট করে খাজনা আদায় বন্ধ করেছে। এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রামে গ্রামে নাইট স্কুলও হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী এক প্রবীণ ব্যক্তির জবানীতে জমিদার কন্যার কাছে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, 'জগতে বুদ্ধিমানরা এত কাল তাদের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, আজ হঠাৎ তাদের ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। পেট না ভরলে আর যে তারা নীতির বচন এবং পুরানো আইন-কানুনের চোখ-রাঙ্গানিতে থাম্‌বে, এমন তো ভরসা হয় না দিদি।'[২] কৃষক জাগরণে আতঙ্কভীত হয়ে জমিদারের জনৈক হিতৈষীকে মন্তব্য করতে শোনা যাচ্ছে : 'কতকগুলো, স্বদেশী ছাপ-মারা প্যাট্রিয়টের পেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে দেওয়া। বল্‌শেভিক প্রোপাগাণ্ডা ও তাদের টাকাই হচ্ছে এর মূলে।...গোড়াতেই একটু বিশেষ সচেতন না হলে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, আপনি নিশ্চয় জানবেন।'[৩] সুতরাং অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্রের আন্তরিক

১ অপ্রকাশিত রচনাবলী : জাগরণ পৃঃ ১১২-১১৩

২ অপ্রকাশিত রচনাবলী : জাগরণ পৃঃ ১৫২

৩ অপ্রকাশিত রচনাবলী : জাগরণ পৃঃ ১৭৯-৮০

সমর্থন না থাকলে, তদানীন্তন রাজনৈতিক পটভূমিকায় জনজাগরণের এমন চিত্র তিনি কখনই তাঁর এ উপন্যাসে তুলে ধরতে পারতেন না।

অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস যখন বেআইনী ঘোষিত হয় তখন তিনি সামতাবেড়ের বাড়ীতে অবস্থানরত বহু কর্মীর অন্নের সংস্থান করেছেন। এ নিয়ে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'লোকের আসার বিরাম নেই দলে দলে। বিশেষতঃ কংগ্রেস বেআইনী হবার দরুণ যাঁরা অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের।'

শরৎচন্দ্র ছিলেন বরাবরই ভীষণ খেয়ালী এবং সেই সঙ্গে রোমাণ্টিক। তাই শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ও মতাদর্শও সেইভাবে সময়ে সময়ে ভাবপ্রবণতার জোয়ারে ভেসে বেড়িয়েছে। ১৯২২ সালে চৌরীচৌরা গ্রামে সত্যাগ্রহীদের পক্ষ থেকে পুলিশের প্রতি আক্রমণে গান্ধীজী মর্মাহত হয়ে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করায শরৎচন্দ্র খুবই বিক্ষুব্ধ হন। 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' প্রণেতা শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায তাঁর সেই মর্মাহত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, 'কি গভীর বেদনা যে তখন তাঁর সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছিল। চোখ দুটো তাঁর সজল হয়ে উঠলো। বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গড়গড়ার নলটি তুলে লাঠির মতন শূন্যে প্রসারিত করে বললেন: গোটাকতক কনষ্টেবল Infuriated mob এর হাতে পুড়ে মরেছে তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এতবড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত? রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে—সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এত ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে?...কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গেল। সহসা নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বল্লেন: নন ভায়ওলেন্স noble idea, কিন্তু achievement of freedom is nobler, hundred times nobler.'।

সুতরাং অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে, কংগ্রেসের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসবাদী উভয় পন্থীরাই মনে করলেন আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। ফলে গান্ধীবাদের প্রতি যে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা এতদিন তারা চেপে রেখেছিলেন

তার প্রকাশ হল। এদের মতই শরৎচন্দ্রেরও ধারণা হল আন্দোলন ব্যর্থ ; তাই তখন থেকেই চরকা-খদ্দরের বিরোধিতা সুরু করলেন। এ সম্পর্কে সমালোচনা করে লিখলেন, 'ভারতের বিশলাখ টাকার খাদি দিয়ে আশী ক্রোর টাকার অভাব পূর্ণ করা যায় না! কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।'

শুধু তাই নয়, মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনকে চরকা খদ্দরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত করার নীতি প্রসঙ্গে ব্যঙ্গোক্তি করে লিখলেন, 'সহসা একদিন এলো মহাত্মার অদ্রোহ-অসহযোগ এবং তার টিকি বাঁধা রইলো খদ্দর ও চরকার দড়িতে।'[১]

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে:ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে সংযুক্ত করার পক্ষে শরৎচন্দ্র গোড়া থেকেই বিরুদ্ধ মতবাদী ছিলেন। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রচেষ্টাকে তিনি ঘুষের সামিল বলে আখ্যা দিলেন।

এছাড়া মহাত্মাজীর সমালোচনায় শরৎচন্দ্র তাঁর আবেগপ্রবণ মন নিয়ে ক্ষোভ করে লিখলেন, 'তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।'

এর পর থেকে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠীর রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শরৎচন্দ্র যেমন গান্ধীবিরোধিতার পথে অগ্রসর হলেন, অন্যদিকে কাউন্সিল, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের মাধ্যমে দেশশাসনের গৌণ ক্ষমতা অর্জনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হযে উঠলেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনার আবেদন প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্রের সেই মনোভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ('পরিশিষ্ট' (খ) (৫)-এ শরৎচন্দ্রের এই অপ্রকাশিত আবেদনটির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে)।

রেভোলিউসনারি বা সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রথমদিকে

১ বাংলার যুব সমিতির অধিবেশনে পঠিত শরৎচন্দ্রের এই ভাষণটি তদানীন্তন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, তাতে কিছু ছাপার ভুল থাকায়, শরৎচন্দ্র ভুল সংশোধনের জন্যে 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় যে চিঠি পাঠান, সে চিঠির নকল 'পরিশিষ্ট' (খ) (২)-এ দেওয়া হয়েছে।

তেমন আস্থা ছিল না। বিপ্লব ও বিদ্রোহ সম্পর্কে তাই ব্যক্ত করেছিলেন : 'কারণ এ কথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কারণ কোথাও দেখেছ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে। ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt. এর Form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে class war, বিপ্লবের মাঝে আছে civil war ; আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই করা যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।' 'আত্মশক্তি'[১] পত্রিকার সম্পাদককে লেখা এক চিঠিতেও [চিঠির প্রতিলিপি 'পরিশিষ্ট' (খ) (২)-এ প্রদত্ত হয়েছে] দেখা যায়, তিনি বলতে চেয়েছেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়।'[২]

কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি আকৃষ্ট হলেন সন্ত্রাসবাদের দিকে এবং এজন্যে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের কোন অসুবিধা দেখা দিল না। দেশবন্ধুর বাড়ীতে রাজনীতির নানান সলাপরামর্শকালীন উপস্থিত এমন অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল শরৎচন্দ্রের। অবশ্য তার আগেও বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগাযোগ হয় ব্রহ্মদেশে। বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিতে বিদেশের পটভূমিকায় তখনকার বিপ্লবের পরিকল্পনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন : 'শ্যাম থেকে সশস্ত্র বিপ্লব-কারীরা বর্মায় আসবে—বর্মার ভারতীয় সৈন্য ও মিলিটারী পুলিশ সে সময় বিদ্রোহ করবে। এই সম্মিলিত দল একযোগে পরে আসাম ও বাংলায় চলে যাবে।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে ক্ষীরোদগোপালকে ১৯০৮ সালে বর্মায় পাঠানো হয়। তিনি প্রথমে রেঙ্গুনে ডেরা করেন। সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর

১ এই পত্রিকার নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রথম প্রকাশ হয় ১৯২২ সালে।

২ এই সম্পর্কে 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের এই বক্তব্যের উত্তরে লিখেছিলেন, 'সিভিল ওযার, আত্মকলহ, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি অভদ্র জিনিষগুলো শুধু যে বিপ্লবের মধ্যে গজায় তা নয়, খাঁটি বিদ্রোহের মধ্যেও তাদের অভাব হয় না।'

ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। শরৎবাবু এই প্রথম বাংলার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অবহিত হন।'[১]

সুতরাং সন্ত্রাসবাদের এই রোমান্টিক চিন্তাভাবনার পটভূমিকায় রচিত হল 'পথের দাবী'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বিপ্লবীদের হেয় করায় যে চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' হল তারই এক প্রতিবাদ। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে যে অভিজ্ঞতার তিনি উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তারই চিত্র ফুটিয়ে তুললেন 'পথের দাবী'তে। এছাড়া 'পথের দাবী' রচনার পরিকল্পনা সম্পর্কেও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, 'অভিজ্ঞতা জমা হ'ত। সমস্ত island গুলো (বর্মা, জাভা, বোর্নিয়ো) ঘুরে বেড়াতাম। সেখানকার লোক অধিকাংশই ভাল নয়—smugglers ; এইসব অভিজ্ঞতার ফল—পথের দাবী।'

[illegible] 'পথের দাবী' হয়ে উঠেছে বিপ্লববাদী চিন্তাভাবনারই এক দলিল। [illegible]

হল এ উপন্যাসে। তা সত্ত্বেও, নানান দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে এ উপন্যাসে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের তীব্র ঘৃণা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তাদের পরিকল্পিত চিন্তাভাবনার পথেই জাতীয় মুক্তির আকাঙ্খাই প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুরতা ও লুণ্ঠনতৎপরতার বিরুদ্ধে 'পথের দাবী' সেদিক থেকে এক জলন্ত প্রতিবাদ এবং যার ফলে পরাধীন দেশে এ বইয়ের ভাগ্যে জুটেছিল বাজেয়াপ্তকরণের রাজনিগ্রহ।

পরবর্তী সময়ে, সমকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত হ'তে পারে—তা সংস্কার দিয়ে, না বিপ্লবের পন্থা দিয়ে—এই প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের মনে জাগে। 'পথের দাবী'তে বিপ্লবের অর্থ সম্পর্কে তিনি সোজাসুজি উত্তর দিয়ে লিখেছিলেন,—'বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন।' চন্দননগরের আলোচনা সভায় শরৎচন্দ্র সংস্কারের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে ব'লেছিলেন, 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি, সংস্কার জিনিষটার মানে কি? ওটা ভালো কিছু নয়।……যেটা খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার ক'রে আবার দাঁড় করান উচিত নয়।'

১ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় : বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৩১০

ব্যক্তিগত জীবনে সন্ত্রাসবাদীদের শুধু মৌখিক সমবেদনাই তিনি প্রকাশ করেননি, তিনি যে গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন সে সম্পর্কে গোপালচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্রের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অবিনাশ ঘোষাল বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য দেওয়ার বিষয়ে শরৎচন্দ্রের চরিত্রের এই দিকটা তুলে ধ'রে বর্ণনা দিয়েছেন: 'শরৎচন্দ্রের একটি রিভলবার ছিল। প্রতি বছর তার লাইসেন্স বদলাতে হ'তো। এ কাজটি করতে তিনি নিজে পুলিসের কাছে যেতেন। এমনি একদিন যখন তিনি যাবার আয়োজন করেছেন আমি গিয়ে পড়ি। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শুধু লাইসেন্স বদলান নয়, টেগার্ট সাহেবের (পুলিশ কমিশনার) সঙ্গেও আমাকে একবার দেখা করতে হয়। তাঁর ধারণা, আমি যখন 'পথের দাবী' লিখেছি তখন বাঙ্গলার বিপ্লবীদের নাড়ির খবর আমি জানি। গত বছরে আমি তাঁর এ ভুলটা ভাঙ্‌বার অনেক চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁর মত বদলাতে রাজী হ'লেন না। তখন আমি বললুম, তাহলে আপনি আমায় ধরেন না কেন? সাহেব খুব হেসে উঠলেন।

—দেখুন, আপনাকে ওরা ধরতে না পারে কিন্তু আপনার সব খবর যে ওরা জানে না—এমন কখনই হতে পারে না।

—দেখ সেদিন বিপিন (বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী) হঠাৎ মহিলার বেশে রাত্রে এসে উপস্থিত—সাতশ' টাকার তার ভীষণ দরকার। ঘণ্টা কয়েক থেকে ভোর রাত্রে সে চলে গেল। ওদের পিছনে তো পুলিশ লেগেই আছে, তাই দু' পাঁচ দিন আমার একটু সন্দেহের মধ্যে কেটেছিল। আর যদি ধরেই নিয়ে যেত, কি আর করতুম! তবে এ বিশ্বাস আমার বিপিনের উপর আছে যে, সে যদি নিজেও ধরা পড়তো, তাহলে পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে আমার টাকা দেওয়ার খবর বার করতে পারতো না। ওর মত একটা দুর্ধর্ষ বিপ্লবী খুব কমই আছে। কই তুমি যে বললে পুলিশ আমার সব খবর রাখে তাহলে এ খবরটা তারা পেল না কেন?'

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উপর শরৎচন্দ্রের সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এই সময় জেল থেকে কিছু রাজবন্দী মুক্তি পাওয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি রাজবন্দীদের প্রতি তেমন কোন উৎসাহ না দেখানোয় শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ

হয়ে হাওড়াতে মুক্ত রাজবন্দীদের নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করেন। হাওড়ার টাউন হলে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় শরৎচন্দ্র নিজে ঐ সংবর্ধনা পত্র পাঠ করেন। 'হাওড়ার সংবর্ধনা সভাটিই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি ও অবদান। এর পূর্বে দেশে আর কখনো বিপ্লবী রাজবন্দীদের প্রকাশ্য সম্বর্ধনা হয়নি।' (শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ৭০)

১৯৩০ সালে বাংলার বিভিন্ন জেলখানায় বিপ্লবী রাজবন্দীরা অনশন শুরু করেন। শরৎচন্দ্র এই অনশনের সংবাদে উৎকণ্ঠিত হয়ে সামতাবেড়ে থেকে আলীপুর জেলখানায় বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ বহু টালবাহানার পর বেশ কিছুদিন পরে বন্দীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাতের অনুমতি দেন। শরৎচন্দ্র সে সময়ে বন্দীদের অনশন ভঙ্গের জন্যে অনুরোধ করেন। তদানীন্তন কোলকাতার এক সংবাদপত্রে বন্দীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই সহানুভূতি সম্পর্কে লেখা হয়, তাঁরও ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে, নিভৃত পল্লীনিবাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেও কলিকাতায় ছুটিয়া আসিতে হইযাছে। বাংলার শ্রেষ্ঠ কুসুমগুলি আজ বিপন্ন। তাঁহাদের বাঁচাইতে হইবে—শরৎচন্দ্রের জেলে ছুটিয়া যাওযায় সে আকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে।'[১]

পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বিপ্লবীযুগের নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে বাংলাদেশে সোসালিজমের আদর্শ প্রচারের কাজ সুরু হয়। অন্যায়, অবিচার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে যে লেখক তার লেখনী ধরতে পেরেছেন সার্থকভাবে, তাঁর কাছে এই আদর্শ যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে উঠে! 'শতশত কর্মী প্রতি সপ্তাহে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করতে লাগলেন এবং নূতন আদর্শ ও আলোকের প্রেরণা লাভ করতে লাগলেন।' এই সময় তাঁকে কেন্দ্র করে হাওড়া-শিবপুরে পর পর কয়েকটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকগুলিতে তিনি বাঙ্গলাদেশে একটি সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা ঠিক করে দেন এবং অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবার উপদেশ দেন।[২]

১ সংবাদপত্রের ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির জন্য পরিশিষ্ট (গ) ১ দ্রষ্টব্য

২ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃষ্ঠা-৭৭

শরৎচন্দ্রের এই 'সোসালিজম্' এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া শুধু যে মৌখিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়—তিনি বাস্তবক্ষেত্রে শ্রমিকদের আন্দোলনের পিছনে যে এসে দাঁড়াতে পেরেছিলেন সে সম্পর্কে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এই সময় হাওড়ায় গার্ডেনরীচের এ. জে. মেইন কোম্পানী নামক একটি বিলাতী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার বাঙ্গালী শ্রমিকরা অত্যাচারে ও শোষণে জর্জরিত হ'য়ে অকস্মাৎ একদিন ধর্মঘট ক'রে বসল। সংবাদ শুনামাত্র শরৎচন্দ্র অগম দত্ত, জীবন মাইতি[১] ও আমাকে নির্দেশ দিলেন ঐ ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করতে ও ধর্মঘটের পরিচালনা করতে।...ধর্মঘটীদের সাহায্য করবার ও ধর্মঘট পরিচালনার প্রাথমিক প্রেরণা তিনিই দিয়েছিলেন।'

পরবর্তী আন্দোলন প্রসঙ্গেও শচীনন্দন বাবু লিখেছেন, 'এই ধর্মঘটে জয়লাভ করার পর অগম, জীবন মাইতি ও আমি হাওড়া মেথর ও ঝাড়ুদার ইউনিয়ন করি।......ইউনিয়ন গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা মেথরদের ধর্মঘট আরম্ভ করি।' এই ধর্মঘটের যৌক্তিকতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'না পেছিয়ে আসা চলবে না, কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। সংঘর্ষটা কি জন্যে হচ্ছে, সেইটেই বড় কথা, কার সঙ্গে হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়। সমাজে মেথর আর বেশ্যা এদের চাইতে worst persecuted আর কেউ নেই, সেই মেথরদের cause নিয়েছ, দ্বিধা সংকোচের কিছু নেই—এগিয়ে যাও।' নিপীড়িত মানুষের জন্যে শরৎচন্দ্রের এই গভীর মর্মবেদনা—তার বলিষ্ঠ সংগ্রামী মনেরই পরিচয় বহন করে।

পরিশেষে, শরৎচন্দ্র একালের মত 'মাস্ লীডার' ছিলেন না। দলীয় রাজনীতির আবর্তে পড়ে, নিজের ভাবপ্রবণ চিন্তাধারা যেদিকে তাঁকে নিয়ে গেছে, সেইদিকেই তিনি ঝুঁকেছিলেন ; তাই কখনও তিনি গান্ধীপন্থী, কখনও নিয়মতান্ত্রিক কংগ্রেসী রাজনীতির ধারক, কখনও বা তিনি সন্ত্রাসবাদের সমর্থক, আবার কখনও সোসালিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী—এ সবই তাঁর খেয়ালী রাজনীতি চিন্তার অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর মত ও পথের স্ববিরোধীতা সত্ত্বেও, তাঁর মত একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক দেশপ্রেমের প্রেরণায় ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন—এইটাই

১ কয়েকবৎসর পূর্বে চরমপন্থীদের হাতে ইনি নিহত হয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের এক বড়ো তাৎপর্য এবং এইজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'বিশ্বমানবের হিতের জন্যই নিজের দেশ, যে-দেশে জন্মেছি, মানুষ হয়েছি, সে দেশকে পর-অধীনতার নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্ত করব[১]। সেদিক থেকে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিকের উর্ধ্বে এক মহান দেশপ্রেমিক।

(১) পরিশিষ্ট (খ) (৩) দ্রষ্টব্য।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার

'মস্ত লাইব্রেরী, যেমন মূল্যবান আলমারি টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব, তেমনি সুশৃঙ্খলায় পরিপাটি করিয়া সাজান। পল্লীগ্রামে এতবড় একটা বিরাট কাণ্ড দেখিয়া বন্দনা আশ্চর্য হইয়া গেল। বোম্বাই সহরে এ বস্তুর অভাব নাই, সে তুলনায় হয় ত তেমন কিছু নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাস করিযা, কোন একজনের নিছক নিজের জন্য এত অধিক সঞ্চয় সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার।'

গ্রন্থাগার সম্পর্কে এই উদ্ধৃতিটি শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' উপন্যাস থেকে নেওয়া এবং গ্রন্থাগারের বর্ণনাটি হোল বিপ্রদাসের গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে। বিপ্রদাসের গ্রন্থাগারে বিরাট সংগ্রহের বই যে শুধু আছে বড়লোকের আভিজাত্য বাড়ানোর জন্যে তাই নয়—বইগুলি যে যথার্থ পাঠ করা হযেছে—প্রয়োজনীয় ও অপ্রযোজনীয় অংশগুলিতে দাগ চিহ্নই তার একটা বড়ো প্রমাণ। তাই শরৎচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসে, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়ে নিয়েছেন, 'দ্বিজদাস বলিল—পড়েন এবং পড়েছেন আলমারি বন্ধ নয়, কোন একটা বই খুলে দেখুন না, তাঁর চিহ্ন হয়ত চোখে পড়বে।'

শরৎচন্দ্রের এই বিপ্রদাস লেখা হয়েছিল সামতাবেড়েতে ব'সে; সুতরাং বিপ্রদাসের গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে চিত্রটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন, বলা যেতে পারে তার প্রভাব পড়েছে সামতাবেড়ের তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপনের

উদ্যোগ থেকে। তাঁর এই গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের যে সব অমূল্য গ্রন্থরাজি রয়েছে এবং তা তিনি যেভাবে উপযুক্ত অংশ বিশেষ দাগ চিহ্নিত ক'রে পাঠ করেছেন তা দেখে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে একটা প্রচলিত ধারণার নিরসন হবে। তিনি যে শুধুমাত্র মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার জন্যে একজন দরদী কথাশিল্পী ছিলেন—এই ধারণার পরিবর্তন হ'য়ে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনের সন্ধান পাওয়া যাবে তাঁর এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বই ও বইয়ের পাতায় [পরিশিষ্ট-ক : গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা দ্রষ্টব্য]। সমসাময়িক জীবনীকাররা সামতাবেড়ের শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত তাঁর এই নিজস্ব গ্রন্থাগার সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। শুধুমাত্র তাঁর লেখা চিঠিপত্রের মধ্য থেকে তার সাহিত্য সাধনার ব্যাপ্তি সম্পর্কে অনেকেই অবহিত করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, সমালোচকগণ তাকে নিছক এক নভেল লিখিয়ে বলে তাঁর এই মনীষার দিকটিকে কেন যে অন্ধকারে রেখে দিয়েছেন তা বোঝা যায়নি।

গ্রন্থাগার স্থাপন ও পুস্তক পঠন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রকার কাফী খাঁ একদা তাঁর এক ব্যঙ্গচিত্রে ব্যক্ত করেছিলেন। শরৎচন্দ্রকে একবার এক গাঁয়ের রাজা-জমিদার তাঁর লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে যান। সেখানে যেযে শরৎচন্দ্র দেখেন, দামী দামী বই সংগ্রহে আছে, তবে অনেক বইয়ের পাতাও কাটা হয়নি। তিনি তখন বেশ বুঝতে পারেন শুধুমাত্র লাইব্রেরী সাজিয়ে জ্ঞানের বহর দেখানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, অত দাম দিয়ে বইগুলো না কিনে, একটা মিস্ত্রী দিয়ে ঠিক বইযের মত কাঠ কাটিযে রং লাগিযে এখানে বসালে তো লোকে ভাববে বই। গেঁয়ো জমিদার তখন অতটা ঠাট্টা বুঝতে পারেননি। কিন্তু আড়ালে কর্মচারীরা শরৎচন্দ্রকে যখন অবহিত করালেন যে, রাজাবাবু এই ঠাট্টা বুঝতে পারলে তার সর্বনাশ অনিবার্য, তখন তিনি সেই রাজবাড়ী থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন।[১]

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা' (১৯৬৮) রূপে 'বাঙলা অনুবাদ সাহিত্য—১৮০১-৬০' বিষয়ে বলতে গিয়ে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল শরৎচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন

ক'রেছেন এই ব'লে, 'সাধারণের মনে হয়তো এই ধারণা বলবৎ যে, শরৎচন্দ্র শুধু কথাশিল্পীই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যচর্চার আর একটি দিকের প্রতিও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বহু বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র সংকলন করিয়া পুস্তক আকারে গ্রথিত করেন। এই পত্রাবলী হইতে মানুষ শরৎচন্দ্রকে আমরা ভাল করিয়া জানিতে পারি। তাঁহার সাহিত্য সাধনার কথাও ইহার কয়েকখানি পত্রে বিধৃত রহিয়াছে। তিনি কয়েকবারই লিখিয়াছেন যে, প্রতিদিন বার ঘণ্টা হইতে চৌদ্দ ঘণ্টা তিনি অধ্যয়নে কালাতিপাত করেন। এই অধ্যয়ন বিভিন্ন ধরণের কঠিন কঠিন মনন সাহিত্যমূলক গ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞান তাঁহার একটি প্রিয় বিষয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধে তাঁহার কতই না আগ্রহ ঐ সব পত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। আবার অবসর সময়ে ছবিও আঁকিতেন। এই সকল কথা আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি'।[১] শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাগল মহাশয়ের এই 'জানিয়া রাখা আবশ্যক'কে ভিত্তি ক'রেই শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি।

ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের গভীর অধ্যয়ন সম্পর্কে ইউসুফ মেহের আলি লিখেছেন, সেখানকার শ্রী এম. কে. মিত্রের লাইব্রেরীর সন্ধান পেয়ে তিনি অধ্যয়নের মধ্যে ডুবে গেলেন। Mill, Kant, Hegel, Schopenhauer প্রভৃতি মনীষীদের দার্শনিক গ্রন্থগুলি তিনি ক্ষুধিতের আগ্রহে অধ্যয়ন করতে থাকেন।'

তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীর এই গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনার পূর্বে তাঁর পূর্ববর্তী জীবন কাহিনী আলোচনা করা যাক্।

রেঙ্গুন থেকে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে তাঁর পঠনপাঠন সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলেন, 'গত দশ বৎসরে ফিজিওলজি, বায়লজি এ্যাণ্ড সাইকোলজি এবং কতক হিষ্ট্রি পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।' গিরীন্দ্রনাথ সরকারও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এই সম্পর্কে লিখেছেন, 'দেখিয়াছি রেঙ্গুনের বার্নাড ফ্রি লাইব্রেরী হইতে অনেক ইংরাজি সমাজনীতি রাজনীতি

ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পড়িতেন।'

শরৎচন্দ্রের এই বই পড়ার ঝোঁকই পরবর্তীকালে যে একটি গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করেছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পেরে। আগ্রহশীলদের জন্যে তাঁর গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বইয়ের শ্রেণীবিভাগযুক্ত একটা তালিকা 'পরিশিষ্টে' দেওয়া গেল। অতি সহজেই এ থেকে আমরা বুঝতে পারি শরৎচন্দ্রের প্রজ্ঞা ও মনীষার পরিচয়।

চন্দননগরের আলাপ সভায় (১৯৩০ সালে) শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রসঙ্গত বলেছেন, 'আমার বাড়ীতে যে বই আছে, তার অধিকাংশ সায়েন্সের বই। সেইজন্যই আমার বইয়ে যুক্তির অবতারণা বা Synthetic result বেশী। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে কথিত এই সায়েন্সের বই কি পরিমাণে ছিল তা তালিকাদৃষ্টে বিচারের ভার সমালোচকদের। আপাততঃ তাঁর গ্রন্থাগারে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সম্পর্কিত আর যে সব বই আছে—মোটামুটি তার একটা আলোচনায় আসা যাক।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকায় দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের লেখা কোন বইযের সংগ্রহ নেই। শুধুমাত্র কবি শরৎচন্দ্রকে যে 'Golden Book of Tagore' বইখানি উপহার দিয়েছিলেন—তা বর্তমান আছে। গ্রন্থাগারে বিশেষ ক'রে নজরে পড়ে ডিকেন্স ও টলষ্টয়ের সমস্ত রচনাবলীর সংগ্রহ। শবৎচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল শরৎচন্দ্রের বিদেশী সাহিত্যিকদের পুস্তক প্রীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, 'বিদেশীদের দু এক খানা বই আমি অনুবাদ করেছিলুম, কিন্তু সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়—ওদের মধ্যে ডিকেন্সের লেখা আমার খুব ভালো লাগতো।' ডিকেন্স-এর লেখা যে সত্যিই ভালো লাগতো তার প্রমাণ তাঁর গ্রন্থাগারের ডিকেন্সের বইয়ের এই সংগ্রহ। অন্যদিকে টলষ্টয়ের পুস্তক সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলা যেতে পারে। টলষ্টয়ের যে তিনি একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তা বোঝা যায় 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটির Immoral আখ্যা খণ্ডন করার জন্যে, তিনি বহুবার বহু চিঠিতে কাউণ্ট টলষ্টয়ের লেখার এবং তাঁর লিখিত 'রিসারেকশন' বইটির উল্লেখ করেছেন।

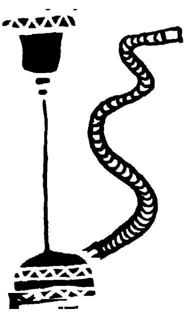
নারী জাতির আত্মসম্মান নিয়ে শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর পরিকল্পনা ছিলো—'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়ে তিনি খান কতক বই লিখবেন। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে দেখা যাচ্ছে, 'Woman in all ages and in all countries' সিরিজের সাতখানি বইয়ের সংগ্রহ। বিভিন্ন দেশের নারীজাতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাবার জন্যেই হয়ত বইগুলি সংগ্রহ ক'রেছিলেন।

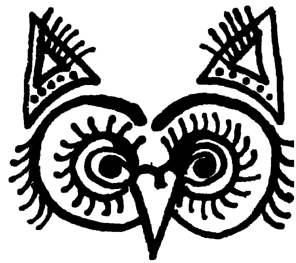
১৯১৩ সালে বন্ধু ফণী পালকে তিনি লিখেছেন, 'আর একটা কথা আমি কয়েকদিন ধরে ভাবছি—এক একবার ইচ্ছে করে, এইচ, স্পেনসার-এর সমস্ত 'সিন্থেটিক ফিলোসফি'র একটা বাঙ্গলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা এবং ইউরোপের অন্যান্য ফিলোসফার যাঁরা স্পেনসার এর শত্রু মিত্র —তাঁদের লেখার ওপর একটা বড়ো রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি।' পরবর্তীকালে 'সমাজ ধর্মের মূল্য' প্রবন্ধে তিনি স্পেনসারের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থাগারের সংগ্রহে স্পেনসারের পুস্তকও দেখা যাচ্ছে।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর বাংলাদেশে সোশ্যালিজমের চিন্তাধারা আমদানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লব ও রুশ-বিপ্লবের মহানায়কদের জীবনী ও চিন্তাধারা সম্পর্কে লিখিত পুস্তকের চাহিদা বেড়ে চলে। এই সব পুস্তকের অধিকাংশ তখন সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ছিলনা; কিন্তু শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে এই সম্পর্কে বহু পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে এবং যথারীতি সংগ্রহের তারিখও পুস্তকের পৃষ্ঠায় নিজস্ব স্বাক্ষরের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, "...এই সময়ে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে হাওড়া শিবপুরে পর পর কয়েকটি বৈঠক হয়। তিনি এই বৈঠকগুলিতে বাঙ্গলাদেশে একটি সোশ্যালিষ্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা ঠিক করে দেন এবং অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবার উপদেশ দেন।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের এই 'সমাজতন্ত্রে'র দিকে ঝোঁক যে এইসব রাজনৈতিক গ্রন্থগুলি থেকে প্রভাবিত হয়েছিল সেসম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই। ১৯২২-২৩ সালে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে মহাত্মা গান্ধীর সম্পাদিত 'Young India' সাপ্তাহিকের গ্রাহক ছাড়াও তিনি বর্তমান কালের কমিউনিষ্ট নেতা ডাঙ্গের সম্পাদিত

'The Socialist' কাগজেরও যে গ্রাহক হয়েছিলেন—তার প্রমাণ তাঁর গ্রন্থাগারে বর্তমান।

সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকগুলি এবং পুস্তকগুলির পাতায় দাগ সমন্বিত শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্যগুলি, শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও মনীষা সম্পর্কে যথেষ্ঠ আলোকপাত করে। আগ্রহশীল গবেষকদের কাছে শরৎ প্রতিভার মূল্যায়নে এই গ্রন্থাগারটি যে যথেষ্ঠ সহায়ক হবে—তা বলা বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে অবহেলায় এবং কীটভ্রষ্ট হ'য়ে বইগুলির আয়ুষ্কাল অবিলম্বেই শেষ হ'তে চলেছে। এখন সরকারী উদ্যোগে রাহুমুক্ত হওয়ার অপেক্ষায়।





নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র কোন এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'সংসারের যা আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জানিনা, কথাসাহিত্যে তার ঠাঁই দিইনি। এইটাই আমার প্রধান সমর্থন।' এইজন্যেই শরৎচন্দ্র ছিলেন জীবন দ্রষ্টা ও রস স্রষ্টা ; তিনি তত্ত্ববিদ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যানী ছিলেন না। তবুও সাহিত্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো কিছু না বলে একেবারে পাশ কাটিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে যে দু-চার কথা তিনি মাঝে মাঝে বলেছেন, সেগুলি ছাড়াও নানা সাহিত্যসভায়, বৈঠকে ও তাঁর চিঠিপত্রে সাহিত্য কি, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ-সংস্কার নীতির সম্বন্ধ, বাস্তবপন্থী সাহিত্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবীন লেখকদের ভূমিকা প্রভৃতি সাহিত্য সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে বহু মূল্যবান কথা বলেছেন।

নতুন লেখকদের প্রতি শরৎচন্দ্রের ছিল আন্তরিক সহানুভূতি। এ ছাড়াও নতুন লেখকদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। নতুনদের কাছ থেকে তিনি বহু কিছুই আশা করতেন। তাই তাদের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ ক'রে তিনি লিখেছিলেন, 'বয়স যাদের কম, তাদের নতুন আকাঙ্খা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও তার সঙ্গে একটা শুদ্ধ মন নিয়ে সত্য সত্য সাহিত্য তাঁরা রচনা করবেন, সাহিত্যের উন্নতি করবেন। বাংলা ভাষায় বড় জিনিস লিখে যাবেন, আন্তরিক চেষ্টা দিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন।'

সাহিত্য সৃষ্টির প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পর্কে শরৎচন্দ্র উপদেশ দিয়ে গেছেন

কোন এক চিঠিতে, "যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, তা তাহারা যত বড়ই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখানো শোনানো দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেই-ই শেষে টের পায়—তা নয়। অনেক বড জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম, অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।'[১]

এ ছাড়াও সাহিত্য রচনার কৌশল সম্পর্কে শরৎচন্দ্র উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখেছেন তাঁর কোন এক শুভাকাঙ্খীকে। সেই চিঠির বিষয়বস্তু থেকে নবীন সাহিত্যিকরা অনায়াসে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'সাহিত্য রচনার কৌশলটাও ত আয়ত্ত করা চাই,...নইলে শুধু শুধু নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল করেই কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই ব্যবসাই ত করি, ঠিক জানি এটুকু শিখিয়ে দিতে আমার বেশি দেরি লাগবে না। কতটুকু লিখতে হয়, কোনটা বাদ দিতে হয়, কোন্‌টা চেপে যেতে হয়—

ঘটে যা তা সব সত্য নয়,
কবি তব মনভূমি, রামের জন্মস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

এতবড় সত্য কথা আর নেই। যত ঘটনা ঘটে, তার সবটুকুত লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট করে বলা কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।'[২]

শরৎচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টির যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন—সেই গভীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই তিনি বহু উপদেশ দিয়ে গেছেন নতুন লেখকদের

১ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র. পৃঃ ১২৫

২ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ১৯৭

উদ্দেশ ক'রে। এর থেকেও নবীন সাহিত্যিকরা অনায়াসেই সাহিত্যরচনার কৌশল সম্পর্কে বহু তথ্য গ্রহণ করতে পারেন।

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কোন একটি ঘটনার বিষয়বস্তু কতখানি সাহিত্যে স্থান দেওয়া যাবে এবং কতখানি গ্রন্থকার নিজের মধ্যে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ রাখবেন—সে সম্পর্কেও তিনি পরিষ্কার একটা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'রচনায় অধ্যায় ভাগ করিতে হয় এবং গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চোদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা পারা যায় না, সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। আর একটা কথা এই যে, বেশি খুঁটিনাটি লইয়া আপনাকে এবং পাঠককে কাহাকেও দুঃখ দেওয়া কর্তব্য নয়। অনেক জিনিষ তাহাদের কল্পনার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া লইবে—এই জিনিসটা শিক্ষা সাপেক্ষ এবং বুদ্ধি সাপেক্ষও বটে।'[১]

নতুন লেখকরা তাদের রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে অতীত দিনের ইতিহাসটিকে সবচেযে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু অতীত দিনের ইতিহাসের উপর গুরুত্ব দিলেই রচনাটির শ্রেষ্ঠত্ব বহুলাংশে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। তাই তিনি অতীত দিনের ইতিহাসটিকে সবচেয়ে সামান্য কথায় বর্ণনা করে দিতে বলেছেন। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'অতীত দিনের ইতিহাসটা যতটা সংক্ষেপে সারিতে পারা যায়—সারা আবশ্যক, কারণ একথা মনে রাখিতেই হইবে বইযের মধ্যে আর সে আসিবে না, সুতরাং তাহার চরিত্র ফুটাইযা তুলিবার খুব বেশী প্রয়োজন হয় না।'[২]

এ ছাড়া গল্পের প্লটের ওপরেও তিনি জোর দিতে নিষেধ করেছেন। প্রথমেই গল্পের প্লট নিযে মাথা ঘামাতে গেলেই—গল্প ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে—এই ছিল তাঁর ধারণা। কতটুকু প্লট লেখার জন্যে প্রযোজন হতে পারে—সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, '...গল্প লিখিতে গিযা প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নেই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে, প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়।'[৩]

১ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ১৯৩
২ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ২০৫
৩ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ২১৫

প্লট সম্পর্কে অপরকে উপদেশ দেওয়া ছাড়া নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছেন, 'অন্যান্য গ্রন্থকারদের যা নিয়ে বিপদ—প্লট পায়না—সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নিই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্যে যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিস আছে, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সেসব—আপনি আসিয়া পড়ে।'[১]

কিন্তু সব সত্বেও নতুন লেখকদের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। বহুদিন ধরে কঠোর পরিশ্রমের পরই আসে এই সার্থকতা। কিন্তু নবীন লেখকরা এতখানি ধৈর্যের পরীক্ষায় অনেক সময় অকৃতকার্য হয়ে পড়েন। শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের মধ্যেও ঠিক এই জিনিসটিরই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কেন না সাহিত্যের আসরে তাঁরও প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছিল অনেক পরে। তাই তিনি নতুন লেখকদের প্রতি স্নেহের সঙ্গে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট করিতে হয়, অসহিষ্ণু হইলে হয় না! এ জিনিস এত দুঃখ এত পরিশ্রমের বলিয়াই ইহার এত মূল্য। অনেক পরিশ্রমই বৃথা যায় বলিযা প্রথমে মনে হয বটে, কিন্তু কোন পরিশ্রমই কোনদিন সত্যসত্যই নষ্ট হয় না—আর একভাবে ফিরিযা আসে।'[২]

সাহিত্য রচনার প্রথম পদক্ষেপে খুঁটিনাটি বিষয সম্পর্কে নবীন সাহিত্যিকদের কাছে এগুলি তিনি তুলে ধরেছিলেন পরম স্নেহ ও প্রীতির সঙ্গে। এবারে তিনি আলোচনা করেছেন, সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হবে—তা নিয়ে। জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতেই হবে—তবে সাহিত্য সৃষ্টি হবে। এর সঙ্গে জীবনের সেই বিচিত্র বাস্তবকে কল্পনার আগুনে পুড়িয়ে তার খাদ বাদ দিয়ে দিতে হবে। তা না হলে তা হয়ত সাহিত্য হ'য়ে উঠবে না—হয়ে উঠবে নিছক ইতিহাস। তাছাডা সাহিত্যের কাজই তো হবে ব্যক্তির জীবনে ও সমাজের জীবনে যা কিছু ঘটছে তাকে রসের বস্তুতে পরিণত করা. জীবনের সীমাহীন বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সকলের সামনে ধরে দেওয়া।

---

১ শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃঃ ২১৫

২ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ১৯৪

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তিনি দেখেছিলেন কতিপয় প্রতিভাবান তরুণ সাহিত্যিক গতানুগতিক ধারায় সাহিত্য রচনা ক'রে চলেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে বাস্তববাদী সাহিত্য রচনা করার জন্যে নবীন লেখকদের কাছে আশা ক'রেছিলেন—কার্যতঃ তিনি দেখলেন, তা হচ্ছে না। তাই নবীন সাহিত্যিকদের এই ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। নবীন সাহিত্যিকরা অবশ্য দুঃখের সঙ্গে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাদের আর Scope নেই এবং রসরচনা বা সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র তারা পান না। অর্থাৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তারা পুরানো গণ্ডীতেই আবদ্ধ থেকে গেছেন।

এদের এই সমস্যায় শরৎচন্দ্র আলোকপাত করে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছিলেন, 'কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করছ। অনেক দিনের সংস্কার, অনেক দিনের সমাজ—এতে ত্রুটি বিচ্যুতি, অভাব-অভিযোগ অনেক থাকতে পারে। বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাও না? মানব জীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এ সব ত রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে—এসব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না? এর জন্যে প্রাণটা কাঁদে না কি?'[১]

আরও পরিষ্কার করে নতুন সাহিত্যিকদের কাছে, সাহিত্য রচনার ধারা কোন্ পথে চলবে—তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাঁর কোন এক ভাষণে। বলেছিলেন, 'যারা বলেন আর্ট ফর আর্টস সেক্—আমি সে দলে নাই। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, যুবকেরা বেকার, মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই—এ অবস্থায় লেখার ধারা কোন পথে চলবে—তা চিন্তা করার দিন এসেছে। আমি আমার লেখার ভেতর দিয়ে কোন সমাধানই করিনি, শুধু গলদগুলো দেখিয়েছি। আমি সাহিত্য সাধনার ব্রত নিয়েছি দুঃখের ভেতর দিয়ে। সোজা কথায় গলদ ও দুঃখকে ব্যক্ত করেছি। আশা করি নতুন লেখকরা এই ব্যথায়

১ শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃঃ ২৩৭

স্থানগুলোকে ভাল করে তুলবেন, সত্যিকারের সমাধানের জন্য চিন্তাধারা দেবেন।'[১]

সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি প্রসঙ্গত বলেছিলেন যে, সমাজ বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা হয় না। এ ব্যাপারে তিনি রুশ সাহিত্যকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।'[২]

আবার অন্যদিকে সাহিত্যে বাস্তবতার দাবী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'সত্যি জিনিষটাই সাহিত্য নয়। সংসারে অনেক ব্যাপার আছে যা সত্যি কিন্তু সাহিত্য নয়। আমার বলবার কথা এই যে, সত্যিটা যেন বনেদের মত মাটির নীচে থাকে এবং তাহলে তার উপরে যে সৌধটা গড়ে তুলবো কল্পনা দিয়ে—সেটা সহজে ডুবে যাবে না।'[৩]

এ সম্পর্কে গভীর অনুভূতির সঙ্গে আরও এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'বাস্তব অবস্থাকে আমি উপেক্ষা করছিনে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যাথা কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।'[৪]

সাহিত্যে বাস্তবতা ছাড়া সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক নীতির সম্বন্ধ কি—তারই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র আলোকপাত করেছেন। সাহিত্য আসলে সমাজের প্রচলিত নীতির গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে কিছুতেই বন্দী রাখতে পারে না। সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক নীতির কোন সম্বন্ধই নেই।

তাই সমাজের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, নবীন

১ দেশ : ভাদ্র, ১৩৬৩, পৃঃ ৪২৯

২ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৯৩

৩ শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃঃ ৩০৩

৪ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৭৮

সাহিত্যিকেরা যখন সাহিত্য রচনা করে চলেছিলেন তখন একদল সমালোচক ও সাহিত্যিক অভিযোগ এনেছিলেন যে, বাংলা সাহিত্য অধঃপাতের দিকে নেমে চলেছে। তাদের অভিযোগ ছিল নবীন সাহিত্যিকদের লেখায় নরনারীর ভালবাসার মধ্যে দুর্নীতিই স্থান পেয়েছে বেশী, অর্থাৎ তথাকথিত সতীত্বের মহিমা প্রচার করা থেকে নবীন সাহিত্যিকেরা বিরত থেকেছেন।

এই অপপ্রচারে শরৎচন্দ্র ব্যথিত হয়ে নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে লিখেছিলেন, 'নবীন লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ এবং টান আছে। তাদের ভুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই ব'লে তাদের লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত ব্যথা লাগে। তা ছাড়া কত বড় অন্যায় অপবাদ তাদের দেওয়া হয়, যখন ইঙ্গিত করা হয়, এরা গরীব বলেই এই সব নোংরা ব্যাপার ঘাঁটাঘাঁটি করে অর্থ রোজগার করতে চায়। আমি ভাল করেই জানি বিরুদ্ধ দলের লোকেরা এই রকমেই কথা বলে বেড়ায়।'[১]

'আর্ট ফর আর্টস সেকে'র পুজারী ছিলেন না শরৎচন্দ্র। তাই তিনি নবীন সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন। শুধু নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি ব্যথিত হয়ে সহানুভূতিই প্রকাশ করেন নি; সেই সঙ্গে তিনি সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি সম্পর্কে জোরালো ভাষায় বলেছিলেন, 'সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই Propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য সাধনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা করা চলে না;...একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম করে ফাঁকি। তার মনে হয় এই ফাঁকির ফাঁকি দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রমিত ক'রে নিযে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধরে ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী ক'রে তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত ক'রে তোলার মত

১ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ২৭৪

পাপ অল্পই আছে। আপাত প্রয়োজন যাই থাক, সেই সংকীর্ণ গণ্ডী হতে একে মুক্তি দিতেই হবে। সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য্য; ঐশ্বর্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্ত্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙ্গিয়ে খাওয়া চলে না, একথা কোন মতেই ভোলা উচিত নয়।'[১]

এর পরেও অতি দামী একটি কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে—নীতির চোখ রাঙ্গানিতে তার মরা চলে না।'[২] এই কথাগুলিই হোল যিনি যথার্থ রসস্রষ্টা তার কথা, শিল্পীর কথা, সাহিত্যিকের কথা।

পরিশেষে, আগামী কালের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে নবীন লেখকদের কাছে বহু আশা ভরসা পোষণ করে তিনি দাবী জানিয়ে গেছেন, 'আরও একটা কথা মনে ছিলো সে অতি আধুনিক সাহিত্য। ভেবেছিলাম এই দিকে একটা ইসারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগত প্রায়, তবু ভাবীকালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত পাবে যে নোঙ্‌রা না করেও অতি আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল পেলব রসানুভূতিই নয়, intellect-এর বলকারক আহার্য্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস সাহিত্যের একটা বড় কাজ। এর পরে তোমরাও যখন লিখবে, তোমাদেরও অনেক পড়তে হবে, অনেক চিন্তা করতে হবে। শুধু চিত্তবিনোদনের হাল্কা ভাবটুকু বয়ে দিলেই অব্যাহতি পাবে না।'

জানিনা, শরৎচন্দ্রের এই উপদেশ আজকের নবীন সাহিত্যিকদের কতখানি কাজে লাগবে?

১ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৯১
২ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৭৯

শরৎচন্দ্র ও ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়

'এই যে সব সাহিত্যিক দেশের জন্য প্রাণপণ করেছেন, তাঁদের পুরস্কার হ'য়েছে শুধু লাঞ্ছনা আর দারিদ্র। প্রভূত ধন-সম্পত্তি অর্জন করে বিত্তশালী হ'তে তাঁরা চান না, তাঁরা চান শুধু একটুখানি স্বচ্ছন্দ জীবন, সর্বনাশা দারিদ্র্যের নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্তি, তাঁরা চান শুধু নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় লিখবার মত একটুখানি অনুকূল আবহাওয়া, অথচ তাঁরা তাও পান না। আজীবন শুধু ভাগ্য-বিড়ম্বিত হ'য়েই তাদের কাটাতে হয়, যাদের কল্যাণ-কামনায় তারা জীবন উৎসর্গ করলে, তারা একবার সেদিকে ফিরেও তাকায় না'—শরৎচন্দ্র একথা লিখেছিলেন আমাদের দেশের ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য ক'রে। কেননা, এই সময় নতুন সাহিত্যিকদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি কটূক্তি বর্ষণ ক'রে একদল সাহিত্যিক ও সমালোচকরা নিন্দায় মুখর হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁদের জবাবে নতুন সাহিত্যিকদের স্বপক্ষে শরৎচন্দ্র তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদের ঢেউ তুলেছেন। নতুন সাহিত্যিকদের মধ্যে উৎসাহ আর উদ্দীপনার অন্ত নেই; সামতাবেড়ের বাড়ী সাহিত্যিকদের তীর্থক্ষেত্র তখন। সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে, কখনও বা নিজেদের লেখা সম্পর্কে তাঁর মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বহু সাহিত্যিকই শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে এসেছিলেন। আর এসেছিলেন পত্রিকার সম্পাদকরা—তাঁদের পত্রিকার জন্যে লেখা দেবার প্রার্থনা নিয়ে। যাঁরা সামতাবেড়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন গাঙ্গুলী, 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদক কুমুদবাবু, 'কালিকলমে'র

সম্পাদক মুরলীধর বসু, 'বাতায়ন' সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল ; সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন গাঙ্গুলী, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, দিলীপকুমার রায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং এমনি আরও যে কত শিল্পী-সাহিত্যিকরা সামতাবেড়ে এসেছিলেন তার হিসাব কে রেখেছে ?

দেশের নবীন আর প্রবীন সাহিত্যিকেরা শুধু সামতাবেড়ের বাড়ীতেই আসতেন না, মাঝে মাঝে চিঠিপত্রে খোঁজ খবরও নিতেন। নিজেদের লেখা বই উপহার দিতেন আর সেই সঙ্গে মতামত দেবার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিতেন। মহিলা সাহিত্যিক আশালতা সিংহ চিঠি লিখেছেন, 'আমার প্রথম উপন্যাসখানি আপনার ঠিকানায় পাঠালুম। যদি অসীম কাজের মাঝে কোন একটুখানি সময়ে গল্পটা পড়ে ভালোমন্দের কথা গুটি পাঁচ ছয় লাইন লিখে দেন, খুব খুশী হবো। আপনার কাছে সাহস করে হয়তো কখনই লিখতে পারতুম না, কিন্তু মণ্টুদার মুখে আপনার কথা এত মধুর করে এতবার শুনেছি যে, সে ভয় ভাঙ্গতেও বেশী দেরী হয় নাই।'[১]

নরেন দেব পাঠিয়েছিলেন তাঁর খেলার পুতুল। শরৎচন্দ্র প্রাপ্তি স্বীকার করে লিখেছেন, 'কাল ডাকে তোমার খেলার পুতুল এসে পৌঁছেছে, কাল রাত্রেই ৭০।৮০ পাতা পড়েছি এবং বাকিটুকু আজ পড়ে ফেলবো স্থির করে রেখেছি···।'

দিলীপকুমার রায় ওরফে মণ্টু তাঁর পাণ্ডুলিপিও শরৎচন্দ্রের কাছে দিয়েছেন অবসর সময়ে তা সংশোধন ক'রে দেবার জন্যে। এমনি এক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে হাওড়া জেলায় বাগনানের নবাসন গ্রামের প্রত্নতত্ত্ব ও লোকশিল্পের সংগ্রহশালা 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালায়'। দিলীপ বাবুর সেই পাণ্ডুলিপিটি আধুনিক সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা একটি প্রহসন —'জলাতঙ্কে প্রেমবীজ'।

এই পাণ্ডুলিপিটি ছাপা হ'য়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানা

১ পত্রটি শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস) সংরক্ষিত

নেই। তবে তাতে শরৎচন্দ্র যে সামান্যটুকু মন্তব্য রেখে গেছেন তা সে সময়ে দু'দল সাহিত্যরথীদের সংগ্রাম কাহিনীর আভাষ মাত্র।

দিলীপকুমার রায় ঐ প্রহসনের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় যে কথা লিখেছিলেন :

> 'উদীয়মাণ তরুণ সাহিত্যিক, বহুমুখী প্রতিভায় দীপ্ত, সর্ব্ব বিষযে স্বকীয়তা যাঁর স্বভাবসিদ্ধ—সেই গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যরসিক, সমালোচক ও সর্বোপরি কবি বুদ্ধদেব বসুকে সাদরে—
>
> প্রতিভা প্রীতি মুগ্ধ
>
> মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৩৮, পণ্ডিচেরি। শ্রীদিলীপকুমার রায'

এই উৎসর্গ পাতাতেই শরৎচন্দ্রের মন্তব্য লেখা। এটা তার স্নেহাশীর্বাদ না ব্যঙ্গোক্তি, বিষ না অমৃত—তা সমালোচকদের বিচার্য। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'মণ্টু, এই লেখাটুকুতে তোমার বিদ্বেষ বুদ্ধিহীন বিশুদ্ধ মনের পরিচয পাই, কিন্তু এ যে, তোমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধুকে প্রায ক্ষেপিয়ে তুলবে। শ'।

শরৎচন্দ্র সে সময়ের কিছু কিছু সাহিত্যিকের লেখা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর আপত্তির কারণ ছিল: 'যৌন সম্বন্ধ নিযে তারা এমন একটা গোলমাল করছে যে, তাদের লেখা সাহিত্য পদবাচ্য কিনা সন্দেহ। এ সমস্ত লেখার অধিকাংশই বাহির থেকে আমদানী করা। নিজের অভিজ্ঞতা নেই তাই পরের ধার করা জিনিষ চালাতে গিযে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুলেছে।' সুতরাং শরৎচন্দ্রের এ মন্তব্য সেই পুরোনো দিনের 'রজনী হল উতলার' গল্প-লেখক বুদ্ধদেব বসু, 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল' আর 'কালিকলম'কে কেন্দ্র করে লেখা। সাহিত্যের রীতি-নীতি নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের, শ্লীল-অশ্লীলের ও ধর্ম-নীতির বাদানুবাদ—অথচ তারই মধ্যে দিলীপকুমার রায় ও বুদ্ধদেব বসুর অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র একসময় এই সাহিত্যের ধর্মযুদ্ধে নিজের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন, 'আধুনিক সাহিত্যসেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুবাক্য বর্ষিত হইয়াছে। বর্ষণ করার পুণ্য কর্মে যাঁহারা নিযুক্ত আমিও তাঁহাদের একজন। 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।' তবে তাঁর এ উক্তির উর্ধেও বলা যেতে পারে, নতুন সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর সস্নেহ আন্তরিকতার যে অভাব ছিল না—একথা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।

শরৎসাহিত্য ও একটি নীতিবিরুদ্ধ পাঠ্য

শরৎচন্দ্র যেদিন বঙ্গভাষার সাহিত্যমন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন, সেদিন তাঁর যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল, সেইসব অসার-প্রবল যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্যে কখনও বা তিনি দু'একটি ভাবপ্রবণ লেখা লেখেন নি এমন নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন মৌন। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাড়াও, অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও অতীত জীবনপ্রণালী সম্পর্কেও যে সন্দেহ, যে সংশয় এবং যে সব তীব্র বিষোদ্গার করা হয়েছিল—তার সমগ্র বিবরণ সংগ্রহ করলে লজ্জায়-অধোবদন হতে হয়।

দেখা যায়, বাণীর বরপুত্র হিসাবে শুধু কলমটি বাগিয়ে তাঁর লেখনী চালনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তাই বোধ হয়, তাঁর বিরুদ্ধে এত সমালোচনা এবং এত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। তিনি মানুষের দরবারে এসে সামিল হয়েছিলেন এইসব অবিচার, কুবিচার, নির্বিচার আর দুঃসহ-সুবিচারের বিরুদ্ধে। কেননা, বিদেশী কোম্পানীর লুটতরাজ ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে প্রতিবাদ ও সমর্থন জানিয়েছিলেন বলেই আদালতের মিথ্যে সাক্ষীতে তাঁকে হেয় করা হয়েছিল।[১] গ্রাম্য সমাজপতিদের রক্তচক্ষুতে তাঁর ভয় ধরেনি বলেই তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি মিথ্যে অজুহাতে ক্রোক করে তাঁকে অপদস্থ করতে চাওয়া হয়েছিল।[২] ক্ষুদে গ্রাম্য জমিদারের দাপট থেকে অসহায় গ্রামবাসীদের রক্ষা

১ 'শরৎচন্দ্র : স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী ও একটি আবেদন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

২ 'শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করার জন্যে তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছিল।[১] এমনকি একবার কোন এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্যক্তি টাকা আত্মসাৎ-এর অভিযোগে অভিযুক্ত বলে খবরের কাগজে ঐ মামলার বিবরণ পাঠ করে কেউ মন্তব্য করেছিলেন—'এই সেই নভেল লিখিয়ে শরৎচন্দ্র।'[২] তাঁর উপন্যাসের নায়িকা-চরিত্রে শ্লীল-অশ্লীল প্রসঙ্গে বহুল প্রচারিত এক সংবাদপত্রে তাঁকে 'অর্দ্ধবন্দিত সাহিত্য সম্রাট' নামে আখ্যা দিয়ে লেখা হযেছিল: 'অর্দ্ধবন্দিত সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য এবার রুখিযা দাঁড়াইয়াছেন। তিনি পূজার ছুটিতে কোথাও না গিয়া, কালীঘাট হইতে রাজাবাজার পর্যন্ত যত বস্তি আর চাকরাণী পাড়া ঘুরিয়া সোমত্ত বয়সের ঝিদিগকে "চরিত্রহীন" তন্ত্রোক্ত "সাবিত্রী ব্রত" দিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন কিরন্ময়ী—অচলা—কমলা প্রভৃতি দুহিতাগণ, নরেশবাবুর মানসী কন্যা শুভাও আসিয়া যোগ দিয়াছে।'[৩] মুসলিম জীবন-চরিত্র নিয়ে লেখা 'মহেশ' গল্পে গো-হত্যার অভিযোগে জনৈক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপানোর অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে এনেছিলেন।[৪] অন্যদিকে ঐ হিন্দু মুরুব্বির মত আবার মুসলমান মাতব্বররাও ঐ গল্পে তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেছিলেন যে, ইসলামধর্মী কোন ব্যক্তির অন্যায়-অবিচার যেন কোন পড়ার বইয়ে না ছাপা হয়।[৫]

উল্লেখিত এসব কাহিনী আমাদের অনেকেরই হয়ত জানা। কিন্তু শত অপচেষ্টাতেও তাঁর যাত্রার গতি কোনদিন রুদ্ধ করা যায়নি। এছাড়াও, শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে অন্য বিড়ম্বনাও জুটেছে। সেই অজ্ঞাত ও বিস্মৃত কাহিনীর তর্ক-বিতর্ক ও বাদ-বিতণ্ডার সমগ্র পরিচয়টি তুলে ধরা হলে একান্তই জানতে পারা যাবে সেকালের নীতিবাগীশদের সাহিত্য সমালোচনার বিচারে তাঁর অপদস্থ হওয়ার ইতিহাস। এ ইতিহাসের পিছনে আছে, তাঁর বিখ্যাত শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ পর্বের নিশীথ অভিযান কাহিনী ছাত্রদের কাছে অপাঠ্য বিবেচনার জন্য আন্দোলন। এ আন্দোলন সে সময়ে শুরু হয়েছিল, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়,

---

১ 'শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ স্মৃতি পূজা: পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শরৎস্মৃতি,

৩ আনন্দম্: ৩য় খণ্ড, ১৯৭৬/অথ শরৎচন্দ্র: বর্তমান কাহিনী ও আগামীকালের রূপকথা

৪ শরৎচন্দ্রের রচনাবলী (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়), পৃঃ ৩৫৩

৫ শরৎচন্দ্রের রচনাবলী (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়), পৃঃ ৩৫৩

আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। শরৎচন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ' তখন প্রকাশিত হয়েছে ; 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটিতে তখন শেষ কলমের তুলি বোলাতে ব্যস্ত তিনি। ঠিক এই সময় তথাকথিত ঐ সংবাদপত্রে ছদ্মনামে জনৈক 'অবজারভার' লেখকের জবানীতে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের কাছে প্রশ্ন রাখা হয় : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত 'সাহিত্য চয়ন' (২য় ভাগ)-এ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযান গল্পে, মধ্যরাত্রে একটি নিরপরাধ ছেলেকে প্রলুব্ধ করে মাছ চুরির এই ঘটনার বিবরণ কি সরলমতি শিশুদের পক্ষে নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে গৃহীত হবে? আলোচ্য সমালোচক ঐখানেই শুধু ক্ষান্ত হননি। আরও প্রশ্ন রেখেছেন যে, শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ অভিযানের মত গল্পে মাছের প্রকৃত মালিকদের বিরুদ্ধে 'শালারা' কথাটির প্রযোগ শিক্ষক মশাইরা কিভাবে ক্লাসরুমে পঠন-পাঠনের সময় উচ্চারণ করবেন? পরিশেষে ঐ প্রশ্নকারী দায়ী করেছেন সে সমযের 'টেক্‌সট্ বুক কমিটি'কে—যাঁরা বহুসংখ্যক পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে 'সাহিত্য চযন' অনুমোদন করেছিলেন। ছাত্রদের নৈতিক আদর্শ ও মানসিক গঠনে এই প্রবন্ধ যে কতখানি অধঃপাতে নিযে যাবে—সেই অভিযোগই তিনি রেখেছিলেন এই কমিটির কাছে।[১]

ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের স্খলন ঘটার আশঙ্কায 'সাহিত্য চয়ন' সংকলনে শরৎচন্দ্রের লেখা বিশেষ এই গল্পটির বিরুদ্ধে সমালোচনার লক্ষ্য যে কি ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয না যে, সে সময়ে স্কুল-পাঠ্য হিসেবে অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপিত ৭১৪টি বইযের মধ্যে 'সাহিত্য চযন' অনুমোদন পাওয়ায় এই সমালোচনার উদ্ভব হয় এবং এই উপলক্ষে শরৎ সাহিত্যের প্রতি কুৎসা রটানোও একটা উদ্দেশ্য হযে পড়ে। বিষযটা এখানেই থেমে থাকেনি। তাই জনৈক চারুচন্দ্র চক্রবর্তী পূর্বোক্ত সমালোচকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন যে, তরুণদের মধ্যে দুঃসাহসিকতা জাগানোর জন্যেই এই অংশটুকু যদি 'সাহিত্য চয়ন'-এ নির্বাচিত করা হয, তাহলে দোষের কি হয়েছে? তিনি যুক্তির অবতারণা করে আরও লিখলেন, বিদ্যাসাগর এবং গান্ধীজীও তো বাল্যকালে পিতামাতার

১ অমৃতবাজার পত্রিকা, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩০

অবাধ্য ছিলেন, তাহলে এঁদের শিশুকালের এইসব দুর্বলতার কাহিনী ছাত্রদের পাঠ করা তো একান্তই অপরাধ। এছাডা রামায়ণ-মহাভারতের মত কাহিনীও যখন স্কুলের পাঠ্য তখন এগুলিতেও যেসব নীতিবিরুদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করা হযেছে—সেই অপরাধে এইসব ধর্মপুস্তকগুলিকেও তো বাদ দিতে হয়।[১]

এ বিষয়ে উল্লেখিত চক্রবর্তী মশাই ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিবাদে সে সময়ে বেশ মুখর হয়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে তখনকার 'মিত্র ইনস্‌টিটিউশন্'-এর জনৈক ছাত্র প্রবোধচন্দ্র ঘোষ শরৎ-সাহিত্যের এই ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযান কাহিনীর উল্লেখ করে ঐ সংবাদপত্রে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন।[২] প্রতিবাদপত্রে তিনি উল্লেখ করলেন, বিখ্যাত উপন্যাসিকের এই লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে যৌবনের যে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ পেযেছে, তা বাংলা সাহিত্যের এক মহান সৃষ্টি এবং এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে ইংরেজী সাহিত্যের 'যোহান বোজার'-এর লেখা 'গ্রেট হাঙ্গার'-এর সঙ্গে। ছাত্রটি পরিশেষে লিখলেন যে, 'শালারা' কথাটির সঙ্গে বাঙ্গালী ছাত্র মাত্রই পরিচিত, কারণ এইসব ছাত্রদের মধ্যে কেউ না কেউ কারুর স্ত্রীর ভাই—যা 'শালা' শব্দে ভূষিত।

যাইহোক, শরৎ সাহিত্যের বিশেষ এই অংশটুকুর জন্যে যে সমালোচনা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা হযেছিল, তারই সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে একান্তই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, "শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্তে' রাত দুপুরে ভাগলপুরের গঙ্গায় একটা ডিঙ্গিতে ভেসে পড়ার বর্ণনাটি আমার কাছে অতি চমৎকার লেগেছিল। লেখকের শক্তির পরিচয় এ বর্ণনায় পুরো ফুটে উঠেছে। যাঁর কলম এসব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক।"

শরৎচন্দ্রকে অপদস্থ করার এই জঘন্য চক্রান্তের হয়ত এখানেই শেষ। কিন্তু এই বাদ-প্রতিবাদে শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল—তা অবশ্য জানা যায়নি। সংবাদপত্রে এই বাদপ্রতিবাদের আরও বছর ছ'য়েক পরে, শরৎচন্দ্র এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, '...আমার লেখায় দেশ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ

১ অমৃতবাজার পত্রিকা, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩০

২ ঐ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩০

হয়ে এলো এবং সনাতন হিন্দু সমাজ জাহান্নামে গেল ব'লে। যাবার আশঙ্কা ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে যদি নজির দিয়ে আমি তার জবাব দিতাম। কিন্তু সে অপকর্ম করিনি—ভাবতাম আমার সাহিত্য রচনা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে একদিন না একদিন লোকে বুঝবেই। যাইহোক, যে দুঃখ নিজে ভোগ করেছি সে আর পরকে দিতে চাইনে'।[১]

বোধহয় এই জন্যই শরৎচন্দ্র তাঁর সম্পর্কে এইসব বাদানুবাদকে হেলায় তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, '…এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের সাহিত্যে আর কারুর অমন বিরুদ্ধ ও মূর্খ সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু তাঁর সহ্য করবার শক্তি ছিল অসীম।'

১ শরৎচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ ৩৪৬

শরৎ সাহিত্যের পাঠান্তর :
'শ্রীকান্ত-৩য় পর্ব' এবং 'বিপ্রদাস'

আধুনিককালের প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের মত শুধু খাতার পাতায় দু' কলম লিখেই শরৎচন্দ্র ক্ষান্ত হননি—সংশোধন ও পরিবর্তন যথেষ্ঠ করেছেন। তাঁর লেখা যে সব পাণ্ডুলিপি এখনও ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলির সঙ্গে মুদ্রিত পুস্তকের লেখা মিলিয়ে দেখলে শরৎচন্দ্রের এই বিশেষ মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায়, তাঁর আখ্যানের ভাষা অধিকতর সুখপাঠ্য করার জন্য চেষ্টার অবধি ছিল না। সেদিক থেকে শরৎ সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে তাঁর রচনার এই পাঠান্তর যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। কিন্তু শরৎ সাহিত্যের পাঠান্তর সম্পর্কে এ যাবত বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়নি। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' শীর্ষক রচনায় এবং শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস) সংগৃহীত 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে যে পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়, তা দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় নিজস্ব ষ্টাইলের ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখার জন্য কিভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে সংশোধন, পরিবর্তন ও সংযোজন করেছেন।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩২৭-২৮ (পৌষ-জ্যৈষ্ঠ) বঙ্গাব্দের যে খণ্ডটি আছে, তাতে ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এই খণ্ডটি উত্তমরূপে বাঁধাই এবং পুস্তনীতে লেখা আছে : 'Office Copy'; এই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষরও রয়েছে।

ভারতবর্ষে এই ধারাবাহিক ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হবার পর যখন পুস্তকাকারে মুদ্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন প্রকাশকের পক্ষ থেকে এই 'অফিস কপি'টি পরিমার্জন ও সংশোধনের জন্য শরৎচন্দ্রকে দেওয়া হয়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এই খণ্ডে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীর' (৩য় পর্ব) মুদ্রিত অংশে শরৎচন্দ্র নিজ হস্তাক্ষরে যে পরিবর্তন ও সংশোধন করেন তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১ম অনুচ্ছেদে, রাজলক্ষীর ভৃত্যের নাম মুদ্রিত হয় 'বেহারী'; এ নামটি সংশোধন করে লেখা হয় 'রতন'।[1]

২য় অনুচ্ছেদে যেখানে মুদ্রিত হয়েছিল, 'রাজলক্ষীর সমস্ত ইতিবৃত্তই যে জানি—' এর বদলে সংশোধন করে লেখা হযেছে : 'রাজলক্ষীরই যে সমস্ত ইতিবৃত্ত জানি।' এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব'-র ত্রয়োদশ মুদ্রণ সংস্করণে এই অংশটিতে করা হয়েছে, ··'রাজলক্ষীর যে সমস্ত ইতিবৃত্ত জানি· ·'।

ঐ অনুচ্ছেদে,· ·'সুন্দর প্রেমের কমল ধীরে ধীরে অবিশ্রান্ত দলের পর দল মেলিয়াছে'—এই বাক্যটিতে উল্লেখিত 'অবিশ্রান্ত' শব্দটির বদলে 'অনুক্ষণ' সংশোধন করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের সর্বশেষ বাক্যটি ছিল, 'তাহাতে এতটুকু মলিনতাও আজো স্পর্শ করে নাই', এর বদলে সংশোধন করা হয়েছে, 'এতটুকু ধুলা বালিও উড়িয়া গিয়া আজো তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে

---

১ ১৩২০ এবং ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'যমুনা'য় 'চরিত্রহীন' প্রকাশের সময় দেখা যায়, শরৎচন্দ্র সতীশের ভৃত্যের নামও রেখেছেন বেহারী। মনে হয় এই জন্যেই শ্রীকান্ত-৩য় পর্বে বেহারীর নাম সংশোধন করে রতন করেন।

নাই।' অন্যদিকে ত্রয়োদশ সংস্করণের পুস্তকে ঐ বাক্যটিতে উল্লেখিত 'আজো' শব্দটি সংশোধন করে 'আজও' করা হয়েছে।

এর পরবর্তী অনুচ্ছেদের মুদ্রিত অংশ, 'নিজেকে দুর্বল, শ্রান্ত ও পরাজিত ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে অসহায় দানের মধ্যে বড একটা দীনতা ছিল।'—এ অংশটির সংশোধন করে লেখা হয়েছে, নিজেকে দুর্বল, শ্রান্ত ও পরাজিত ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীর হাতে একদিন আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন সেই পরাভূতের আত্মত্যাগের মধ্যে বড় একটা দীনতা ছিল।'

৩য় পরিচ্ছেদে, সন্ন্যাসী আনন্দকে রাজলক্ষ্মী 'ঠাকুরপো' ব'লে যেখানে সম্বোধন করেছেন, সেখানে 'ঠাকুরপো'. শব্দটির বদলে 'আনন্দ' শব্দটি বসানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী অনুচ্ছেদে, যেখানে রাজলক্ষী উক্তি করেছে, 'তবে বুঝি তোমাদের একটা দল আছে, ঠাকুর পো?'—এখানে এই 'ঠাকুর পো' কথাটির বদলে যথারীতি 'আনন্দ' কথাটি বসানো হয়নি। মনে হয় এটি শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

৫ম পরিচ্ছেদের মধ্যে যে অনুচ্ছেদে রাজলক্ষ্মীর এই উক্তি মুদ্রিত হয়েছে: 'কিন্তু এসব বিধিব্যবস্থা করে গেছেন যাঁরা তাঁরা ছিলেন ত্রিকালদর্শী ঋষি··' এর পরের নিম্নলিখিত অংশ শরৎচন্দ্র বাদ দিয়েছেন:

'হতেও পারে, এই বলিয়া আমি সংক্ষেপে এই অনাবশ্যক কৌতূহল দমন করিযা লইলাম। পাছে এই সকল আলোচনার সূত্র ধরিযা না জানিযা কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গ আলোড়িত করিয়া তুলি এই ভয় আমার সর্বদাই হইত। কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহা চক্ষের নিমেষে বুঝিয়া লইল। কারণ, আমি বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি, সে আমার মনের অত্যন্ত গূঢ় কথাও দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইত।' অন্যদিকে ত্রযোদশ সংস্করণের মুদ্রিত পুস্তকে এই অনুচ্ছেদের শেষ লাইনটি পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে,—'আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথাগুলো যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইত।'

এই পরিচ্ছেদে ডোমেদের বিবাহ প্রসঙ্গে যে রাখাল পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—তা পূর্বে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায 'যদু' নামে মুদ্রিত হয়েছিল।

আলোচ্য 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার বাঁধানো খণ্ডটিতে শরৎচন্দ্র যে পরিবর্তন ও সংশোধন করেছিলেন এখানে শুধুমাত্র তারই উল্লেখ করা গেল।

বিপ্রদাস :

'বিপ্রদাস' উপন্যাসটি 'বেণু' পত্রিকায় ১৩৩৬-৩৮ বঙ্গাব্দে ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'বেণু' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৯ সাল থেকে ১৩৪১ সাল পর্যন্ত পুনরায় প্রথম থেকেই প্রকাশ করা হয়।

'বিপ্রদাস' এর লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এর নামকরণ। কারণ পারিবারিক জীবনে বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের আপন ছোট মামা—যিনি চুরাশী বৎসর বয়সে গত ১৩৫৭ সালে পরলোকগমন করেছেন। 'তাঁকে তিনি পুরোপুরি বাস্তবে যা দেখেছেন, গ্রন্থে হুবহু সেইভাবেই চিত্রিত করেছেন।' মানুষ হিসেবে বিপ্রদাস সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বিপ্রদাস ছিলেন স্বধর্ম পরায়ণ, আচারনিষ্ট, গুরু এবং দেবতায় ভক্তিমান, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক এবং পূজা পাঠ না করে তিনি জলগ্রহণ করতেন না, সুখাদ্য বলতে বুঝতেন একমাত্র সেই খাদ্য যা দেবতার ভোগে নিবেদন করা চলে,—অখাদ্য যা চলে না; ধর্ম অর্থে তিনি বুঝতেন সনাতন হিন্দু ধর্ম, ভ্রমণ অর্থে বুঝতেন তীর্থ ভ্রমণ......চলতেন কেবলমাত্র সমাজের লৌহময় রেল বাঁধান পথে......সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রবল অনুরাগ ছিল। কলেজ জীবনে প্রবেশ করবার পূর্বেই তিনি দুর্দমনীয় সংস্কৃত ব্যাকরণকে বেশ খানিকটা বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ইত্যাদি।"[১]

বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ 'বেণু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিপ্রদাস' উপন্যাস সম্পর্কে সম্প্রতি এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, শরৎচন্দ্র যখন বিনা দক্ষিণায় তাঁদের পত্রিকায় উপন্যাস দেবার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন যে জমিদারী প্রথা যখন যাচ্ছেই না তখন, উপন্যাসটি যেন প্রজাবৎসল জমিদার ও প্রজাদের নিয়ে লেখা হয়। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস লেখার সময় হেমবাবুকে বলেছিলেন—'আমার এক আপন মামা আছেন, তাঁর নাম বিপ্রদাস। তিনি

১ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল : শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী, পৃঃ ১১৮-১১৯

অতি ধার্মিক লোক। তাঁর নাম দিয়েই উপন্যাসের নামকরণ করেছি এবং উপন্যাসে তাকে প্রধান চরিত্ররূপে দাঁড় করাব ঠিক করেছি।'[১]

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই হেমচন্দ্রবাবুর কাছে 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের গোড়ার দিককার পাণ্ডুলিপি যে থেকে গেছে তা তিনি তাঁর ঐ প্রবন্ধে জানিয়েছেন। তবে এই পাণ্ডুলিপি থেকে পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে কোন পাঠান্তর আছে কিনা তা জানা যায়নি। কিন্তু পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের ১৬২ পৃষ্ঠা থেকে ১৬৬ পৃষ্ঠার যে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হয়েছে, তা থেকে মুদ্রিত 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের মধ্যে যে পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়, তার বিবরণ এই সঙ্গে দেওয়া গেল।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে ২০শ পরিচ্ছেদের ১৪ অনুচ্ছেদে যেখানে আছে, 'বিপ্রদাস তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই—কিন্তু মায়ের কাছে আছে। একটা বোঝা পড়ার দরকার—বুঝলিরে দ্বিজু বুঝলি?' মুদ্রিত 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে এই অংশের পরিবর্তন করা হয়েছে, 'স্নেহ-হাস্যে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল আচ্ছা জানাবো কিন্তু বিশ্বাস করবে কি না জানিনে। তবে, সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই,—আছে শুধু একজনের কাছে সে, মা। বোঝা-পড়া তোদের একটা হওয়া দরকার,—বুঝলি রে দ্বিজু?'

১৫ অনুচ্ছেদের ৩য় লাইনে, 'এইটেই ভেবে পাইনে। একটু থামিয়া বলিল, আমার কপালে সবই হয়েছে উল্টো।' এই অংশের পরিবর্তন করা হয়েছে,'...এইটেই ভেবে পাচ্ছিনে। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, আমার কপালে সবই উল্টো।'

ঐ অনুচ্ছেদের পরবর্তী লাইনে আছে: '...কিন্তু দিয়ে গেলেন না কানাকড়ির সম্পত্তি, দিলেন আপনি।' মুদ্রিত হয়েছে,'...কিন্তু দিয়ে গেলেন না কানাকড়ির সম্পত্তি—সে দিলেন আপনি।' এর পরবর্তী লাইনে: 'মা গর্ভে ধারণ করলেন কিন্তু লালন পালন করলেন অন্নদা দিদি'—এই বাক্যের মধ্যে 'লালন' কথাটি মুদ্রিত অংশে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার পরের লাইনে,—'মানুষ করলেন বৌদিদি।' এই বাক্যটিতে করা হয়েছে: 'মানুষ

করে তুললেন বৌদিদি।' তারও পরের লাইনে…'পিতা ধর্ম এবং স্বর্গাদপি গরীয়সী', এই বাক্যটির বদলে, 'পিতা ধর্মঃ এবং মাতা গরীয়সী'—এইভাবে মুদ্রিত অংশে সংশোধন করা হয়েছে। সব শেষে, 'আপনিই বলুন না?'—মুদ্রিত অংশে 'না' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৬ অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনে লেখা হযেছিল, 'বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, মায়ের মামলা নিয়ে ওকালতি করব না দ্বিজু, সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি।' মুদ্রিত অংশে করা হয়েছে, 'বিপ্রদাস কহিল, মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি করবো না সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি।' এই অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে যেখানে ছিল—'অর্দ্ধেক বিষয়ের তুই মালিক'—তা মুদ্রিত হয়েছে, 'অর্দ্ধেক বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক।'

১৭ অনুচ্ছেদে পাণ্ডুলিপিতে আছে : 'দ্বিজ বলিল হতে পারে, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর'—মুদ্রিত হয়েছে, 'দ্বিজদাস বলিল, হ'তে পারে সত্যি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর—'।

১৯ অনুচ্ছেদের যে লাইনটিতে ছিল, 'এতকাল যিনি আমাকে সকল দিক দিযে রক্ষে করে এসেছেন এ তাঁর মুখেই শুনেচি।'—এটি মুদ্রিত হয়েছে, 'এতকাল যিনি আমাকে সকল দিক দিযে রক্ষে করে এসেচেন সে তাঁর মুখেই শোনা।'

২০ অনুচ্ছেদে,—'কিন্তু তোর বৌদিতো সে উইল পড়ে দেখেনি। এমন ত হতে পারে বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলেই রাগ করে আমি পুড়িয়ে ফেলেচি।'—এই অংশটি মুদ্রিত হযেছে, 'তা হতে পারে, কিন্তু তোর বৌদিদি তো সে উইল পড়ে দেখেননি। এমন ত হতে পারে বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ ক'রে আমি তা পুড়িয়েচি। অসম্ভব ত নয।'

২১ অনুচ্ছেদে, পাণ্ডুলিপিতে যেখানে আছে, 'শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে দ্বিজদাসের মুখ প্রথমে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা, আপনি যে কখনো মিথ্যে বলেন না? কিন্তু আপনার মুখের এই প্রথম মিথ্যে আমি চিরকাল নোট করে রাখবো। কিন্তু বিপাকে পড়লে এও হয়। সে যাক বলুন, কি আমাকে এখন থেকে করতে হবে।' (মার্জিনে এর পাশাপাশি যে কথা লেখা

ছিল, 'যুধিষ্ঠিরেরটা নোট করে গেছেন বেদব্যাস আর আপনারটা নোট করে রাখব আমি।') এই অনুচ্ছেদটি মুদ্রিত হ'য়েছে, 'শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে দ্বিজদাস প্রথমটা খুব হাসিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আপনি যে কখনো মিথ্যে বলেন না? দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যেটা নোট করে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, আর কলিতে আপনারটা নোট করে রাখবে দ্বিজদাস। দুই-ই হবে সমান। যা হোক এটা বোঝা গেল বিপাকে পড়লে সবই সম্ভব হয়। পাপ বাড়াবেন না, বলুন এখন থেকে কি আমাকে করতে হবে।'

২২ অনুচ্ছেদে,—'আমাদের কারবার বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত দেখতে হবে।' —এই বাক্যটি মুদ্রিত হযেছে, 'আমাদের কারবার বিষয-আশয় সমস্ত দেখতে হবে।'

২৩ অনুচ্ছেদের অংশ বিশেষের বহু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া গেল: 'কিন্তু কেন? কিসের জন্য আমি এত ভার বইতে যাবো? আমাকে বুঝিয়ে দিন আপনি একা পারছেন না? অসম্ভব। আমি নিষ্কর্মা, অপদার্থ হ'য়ে যাচ্ছি? বেশ তাই মেনে নিলুম। মাকে বলবেন পদার্থে আমার দরকার নেই, অপদার্থ হয়েই আমি দিন কাটিয়ে দেবো তাঁকে ভাবতে হবে না। আপনি থাকতে আমি টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোঝা বইব না। শেষে আপনার মত ঘোরতর বিষয়ী হ'য়ে উঠবো নাকি? লোকে বলবে ওর শিরার মধ্যে দিযে বয়না রক্ত, বয় শুধু টাকার স্রোত। কিন্তু বলিতে বলিতে লক্ষ্য করিল বিপ্রদাস যেন অন্যমনস্ক হইয়া আর কিছু ভাবিতেছে।— বলিল দাদা সত্যিই কি আপনি চান আমি বিষয় কর্ম দেখি? আমার দেশের কাজ ছেড়ে দিয়ে?'

মুদ্রিত অংশে, এই অনুচ্ছেদটি যেভাবে আছে: 'কিন্তু কেন? কিসের জন্য এত ভার আমি বইতে যাবো আমাকে বুঝিয়ে দিন আপনি একা পারচেন না নাকি? অসম্ভব। আমি নিষ্কর্মা অপদার্থ হয়ে যাচ্চি? না যাচ্চিনে। তবু মা জিজ্ঞেসা করলে তাঁকে জানিযে দেবেন পদার্থের আমার দরকার নেই, অপদার্থ হয়েই আমি দিন কাটিয়ে দেবো তাঁকে ভাবতে হবেনা। আপনি থাকতে টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোঝা আমি বইব না। শেষে কি আপনার মতো ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠবো নাকি? লোকে বলবে ওর শিরার মধ্যে

দিয়ে রক্ত বয়না, বয় শুধু টাকার স্রোত। কিন্তু বলিতে বলিতে লক্ষ্য করিল বিপ্রদাস অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছে, তাহার কথায় কান নাই। এমন সচরাচর হয় না,—এ স্বভাব বিপ্রদাসের নয়। একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, দাদা, সত্যিই কি চান আমি বিষয় কর্ম্ম দেখি, যা আমার চিরদিনের স্বপ্ন সেই স্বদেশ-সেবায় জলাঞ্জলি দিই ?'

২৪ ও ২৫ অনুচ্ছেদ মুদ্রিত অংশে আছে, পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়নি।

২৬ অনুচ্ছেদ পাণ্ডুলিপিতে যা আছে, 'বিপ্রদাস সহসা উত্তর দিল না। মনে মনে কি সব যেন চিন্তা করিতে লাগিল। পরে বলিল, আমি আছি সত্য কিন্তু আমি নেই এও তো হতে পারে দ্বিজু ?'—মুদ্রিত অংশে এটিকে সংশোধন করা হয়েছে, 'বিপ্রদাস এক মুহূর্ত মৌন থাকিযা বলিল, এর কারণ ত খুবই স্পষ্ট দ্বিজু। আজ আমি আছি কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর আমি নেই।'

২৭ অনুচ্ছেদে পাণ্ডুলিপির যেখানে আছে, 'দ্বিজদাস তৎক্ষণাৎ বলিল, না হতে পারে না, আপনি নেই, কোথাও নেই—এ আমি ভাবতে পারিনে দাদা।' —এই অংশটিকে মুদ্রিত পুস্তকে করা হয়েছে, 'দ্বিজদাস জোর দিযা বলিয়া উঠিল, না, ঘটতে পারে না। আপনি নেই—কোথাও নেই আমি এ ভাবতে পারিনে।'

২৮ অনুচ্ছেদে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বিপ্রদাস ভায়ের মুখের দিকে চাহিযা মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, সংসারে সব ঘটে দ্বিজু—এমন কি অসম্ভবও, এই কথাটা মনে করতে যারা ভয পায় তারা আপনাকে ঠকায়। কিন্তু এমন ত হতে পারে আমি ক্লান্ত আমার ছুটির দরকার। তবু দিবিনে তুই।' মুদ্রিত অংশে করা হযেছে, 'তাহার বিশ্বাসের প্রবলতা বিপ্রদাসকে আঘাত করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, সংসারে সবই ঘটে রে, এমন কি অসম্ভবও। এই কথাটা ভাবতে যারা ভয় পায তারা নিজেদের ঠকায়। আবার এমনও হতে পারে আমি ক্লান্ত, আমার ছুটির দরকার,—তবু দিবিনে তুই ?'

২৯ অনুচ্ছেদের পাণ্ডুলিপির অংশ, 'দ্বিজদাস বলিল, না দাদা পারবো না দিতে, তার চেয়ে অনেক সহজ আপনার আদেশ পালন করা। আমি তাই করবো। বলুন কি করতে হবে।'—মুদ্রিত অংশে, 'না দাদা, পারবো না

দিতে। তার চেয়ে সহজ আপনার আদেশ পালন করা। বলুন, কবে থেকে আমাকে কি করতে হবে?'

৩০ ও ৩১ অনুচ্ছেদের নিম্নলিখিত লাইন দুটি মুদ্রিত অংশে নাই:

'—তোকে নিজে সমস্ত দেখতে হবে।

—কবে থেকে বলুন।'

৩২ অনুচ্ছেদে পাণ্ডুলিপির অংশে রয়েছে, 'আজ থেকে এ ভার তোর।' মুদ্রিত অংশে হয়েছে, 'আজ থেকেই এ সংসারের সব ভার নিতে হবে।'

৩৩ অনুচ্ছেদের পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে, 'আজ থেকে? বেশ, তাই হবে দাদা। আপনার অবাধ্য হবো না। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, বিপ্রদাস সাহাস্যে বলিল, তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না রে আমি জানি। কথাটা এইখানেই সেদিন শেষ হইল।' (পাণ্ডুলিপির পর পৃষ্ঠায়) 'কথাটা এইখানেই শেষ হইল'—এই অনুচ্ছেদটি মুদ্রিত পুস্তকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩৪ অনুচ্ছেদের প্রায় প্রত্তিটি লাইনই সংশোধন করা হয়েছে। সুতরাং পাণ্ডুলিপিতে যা ছিল তা উদ্ধৃত করা হল: 'দ্বিজদাসের কাজ সুরু হইল আজ হইতে। সে অলস, অকর্ম্মণ্য, উদাসীন, তাহার বিরুদ্ধে এই ছিল সেকালের চিরদিনের অভিযোগ, কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের ব্রত প্রতিষ্ঠার সুবৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল যখন একাকী তাহার পরে তখন এ দুর্নাম অপ্রমাণ করিতেও তাহার দুই তিন দিনের বেশি সময় লাগিল না। এই অনভ্যস্ত গুরুভার সে যে এমন স্বচ্ছন্দে বহন করিবে এ আশা বিপ্রদাস করে নাই, কিন্তু তাহার নিরলস উদ্যম ও সুশৃঙ্খল কর্মপটুতায় যেন সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহা গাড়ী বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাড়ী পাঠাইল। যাহা সঙ্গে লইবার তাহা সঙ্গে রাখিল, আত্মীয় স্বজন কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া যথাযোগ্য সমাদরে রওনা করিয়া দিল—এখানকার সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আজ বিকালে যাত্রার দিনে সে দাদার শেষ আদেশ গ্রহণ করিতে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে বসিয়া বন্দনা। ৩।৪ দিন সে আসে নাই, কাজের ভিড়ে তাহার কথাটা সে একপ্রকার ভুলিয়াই ছিল—আজ তাহাকে হঠাৎ দেখিয়া ভারী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু

শুধুই মামুলি একটা নমস্কার করিয়া শিষ্টাচার সারিয়া বলিল, দাদা, আজ রাত্রের ট্রেনে আমি বাড়ী যাচ্চি—সঙ্গে যাচ্ছেন অক্ষয়বাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেয়ী।' (পাণ্ডুলিপির এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী অংশ মুদ্রিত অংশের ২টি অনুচ্ছেদের পরে সংযোজিত হয়েছে এবং তৎপরিবর্তে এই অনুচ্ছেদের মুদ্রিত অংশে কিছু নতুন পংক্তির সন্নিবেশন হয়েছে)।

উল্লেখিত ৩৪ অনুচ্ছেদের মুদ্রিত অংশে যা করা হয়েছে : 'দ্বিজদাসের কাজ সুরু হইয়া গেল। সে অলস, অকর্ম্মণ্য, উদাসীন এই ছিল সকলের চিরদিনের অভিযোগ; কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের ব্রত প্রতিষ্ঠার সুবৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সর্বপ্রকার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল যখন একাকী তাহার, পরে তখন দুর্নাম অপ্রমাণ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। এই অনভ্যস্ত গুরুভার সে যে এত স্বচ্ছন্দে বহন করিবে এতখানি আশা বিপ্রদাস করে নাই, কিন্তু তাহার নিরলস সুশৃঙ্খল কর্মপটুতায় সে যেন একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহা গাড়ী বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাড়ী পাঠাইল, যাহা লইবার তাহা সঙ্গে রাখিল, আত্মীয়-কুটুম্বগণকে একত্র করিযা যথাযোগ্য সমাদরে রওনা করিয়া দিল, এখানকার সকল কার্য সমাধা করিযা আজ গৃহে ফিরিবার দিন সে দাদার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে তাঁহার ঘরে ঢুকিযা দেখিল সেখানে বসিয়া বন্দনা। সেই যাবার দিন হইতে আর সে আসে নাই, তাহার কথা কাজের ভিড়ে দ্বিজদাস ভুলিয়াছিল—আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইযা মনে মনে সে আশ্চর্য হইল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া শুধু একটা মামুলি নমস্কার শিষ্টাচার সারিয়া লইযা বলিল, দাদা আজ রাত্রির গাড়ীতে আমি বাড়ী যাচ্ছি; সঙ্গে যাচ্চেন অক্ষয়বাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেযী।' এই অনুচ্ছেদেরই পরবর্তী অংশ যা মুদ্রিত হয়ে সংযোজিত হযেছে, (পাণ্ডুলিপিতে যে নেই, তা ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে) তা হ'ল : 'আপনার কলেজের ছাত্ররা বোধ করি কাল পরশু যাবে, তাদের ভাড়া দিয়ে গেলুম। অনুদিকে কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন? কিন্তু দিন তিন চারের বেশি বিলম্ব করবেন না যেন।'

৩৫ ও ৩৬ অনুচ্ছেদের নিম্নোক্ত লাইনগুলি পাণ্ডুলিপিতে নেই।

'আমাকে কি যেতেই হবে ?

হ্যাঁ। না যান তো একজোড়া খড়ম কিনে দিন নিযে গিয়ে ভরতের মতো সিংহাসনে বসাবো।'

৩৭ অনুচ্ছেদ আরম্ভ হয়েছে পাণ্ডুলিপির ৩৪ অনুচ্ছেদের পরবর্তী বাকী অংশ নিযে। তাতে লেখা ছিল, 'বিপ্রদাস বিস্ময় প্রকাশ করিযা কহিল, অক্ষয়বাবু যাবেন? কিন্তু তাঁর কলেজের কাজ কামাই হবে যে?' মুদ্রিত অংশে করা হয়েছে, 'বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ফাজিলের অগ্রগণ্য হয়েছিস্ তুই; কিন্তু আশ্চর্য করলি অক্ষযবাবুর কথায়। তিনি যাবেন কি কোরে? তাঁর ত ছুটি নেই—কাজ কামাই হবে যে?'

৩৮ অনুচ্ছেদে পাণ্ডুলিপির অংশ, 'দ্বিজদাস কহিল, হবে। কিন্তু তার চেযেও ঢের বড কাজ হবে বড ঘরে মেযে দিতে পারাটা। টাকাওয়ালা জামাই ভবিষ্যতের অনেক ভবসা, কলেজের বাঁধা-মাইনের অনেক বেশি। তাঁদের লাভ-লোকসানের হিসেব বোধ আপনার চেযে কম নয।' এই অনুচ্ছেদ মুদ্রিত অংশে হয়েছে, 'দ্বিজদাস বলিল, তা হবে; কিন্তু লোকসান নেই—ওদিকে তার চেয়েও ঢের বড কাজ হবে, বড় ঘরে মেয়ে দিতে পারাটা। টাকাওযালা জামাই ভবিষ্যতের অনেক ভরসা—কলেজের বাঁধা মাইনের অনেক বেশি।'

৩৯ অনুচ্ছেদে পাণ্ডুলিপির অংশটি হুবহু মুদ্রিত হযেছে।

৪০ অনুচ্ছেদে, পাণ্ডুলিপিতে যা লেখা আছে, 'জানি কিনা বৌদিদিকে জিজ্ঞেসা করে দেখবেন। সৌজন্যের বৃথা অপব্যয করিনে এই আমার দোষ।' এটি মুদ্রিত অংশে হযেছে, 'দ্বিজদাস বলিল, জানি কিনা বৌদিদিকে জিজ্ঞেসা করে দেখবেন। সৌজন্যের বাজে অপব্যয় করিনে শুধু এই আমার দোষ।'

৪১ অনুচ্ছেদে পাণ্ডুলিপির অংশ, 'বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তোর সাক্ষী বৌদি। মাতালের সাক্ষী শুঁড়ি।' এখানে মুদ্রিত অংশে করা হয়েছে, 'শুনিয়া বিপ্রদাস না হাসিয়া পারিল না, বলিল, তোর একটি সাক্ষী শুধু বৌদিদি। যেমন মাতালের সাক্ষী শুঁডী।'

৪২ অনুচ্ছেদে পাণ্ডুলিপির ১ম পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে, 'দ্বিজদাস কহিল, আপনার কথাটাও মধু-মাখা হলোনা দাদা।' মুদ্রিত অংশে করা হয়েছে,

'দ্বিজদাস কহিল, তা হোক, কিন্তু আপনার কথাটাও ঠিক মধু-মাখা হচ্চে না দাদা।'

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত অংশ পরিবর্জন করা হ'য়েছে :

'মুখুয্যে মশাই আমি সঙ্গে যাবো।

বিপ্রদাস সবিস্ময়ে কহিল, কোথায়? বলরামপুরে?

বন্দনা বলিল, নিয়ে যান্‌তো রাজি আছি। কিন্তু এখন সে যাওয়ার কথা বল্‌চিনে, বলচি দক্ষিনেশ্বরে যাবার, সাধুজিকে দেখবার ভারি ইচ্ছে হচ্চে,—আর যদি আপত্তি না করেন তো মা-কালীকেও দর্শন করে আস্‌বো।

কিন্তু তুমি তো এসব বিশ্বাস করো না।

না, করিনে, কিন্তু তাই বলে দেখ্‌বার ইচ্ছে হবেনা কেন? সংসারে সবাই কি সব বিশ্বাস করে, তা বলে কি তারা চোখ বুজে থাকে?

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, তবে চলো। কিন্তু এঁরা ফিরে এলে তাঁদের দেখ্‌বে কে? তুমি আমি দুজনেই চলে গেলে তো ঠিক হবে না।

বন্দনা বলিল, ঠিক হবে মুখুয্যে মশাই, কোন চিন্তা নেই। অন্নদাকে বলে সমস্ত বন্দোবস্ত করে আমি এখুনি আস্‌চি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরে উভয়ে গাড়ীতে বসিয়া বন্দনা বলিল, আমি শুনেচি আপনি ভারি পণ্ডিত। এদেশ ওদেশ দুদেশের সমস্ত বিদ্যেই আপনার আয়ত্ত। অতবড় লাইব্রেরির প্রত্যেক বইটি আপনার মুখস্ত।

এ সংবাদ দিলে কে? দিদি?

না, আপনার ছোট ভাই দ্বিজবাবু।

এটা ওর একটা বাতিক। না বলে বোধ হয় স্বস্তি পায়না।

বন্দনা এ লইয়া আর তর্ক করিল না। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, মুখুয্যে মশাই, সাধু-সন্ন্যাসী আপনি বিশ্বাস করেন?

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, বিশ্বাস না করবার হেতুটা কি? ওরা যে সংসারে রয়েছে এতো সর্ব্বদাই চোখে পড়ে।

বন্দনা বলিল, সে আমারও পড়ে। আমি মানুষ গুলোর কথা বলিনি, জিজ্ঞেসা করচি ওরা যা' বলে তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

ওরা কি বলে ?

কি বলে তার আমি কি জানি ? আমি কি তাদের জিজ্ঞেসা করেচি না কি ?

বন্দনা মনে মনে বুঝিল প্রশ্নটা বোকার মতো হইয়া গেছে। একটু মৌন থাকিয়া কহিল, সেই কথাই তো জান্‌তে চাইচি, আপনিই বলুননা ওরা কি বলে। বলুন না কিসের জন্যে ওদের দেখ্‌তে যাচ্ছেন।'



একত্রিশে ভাদ্রের শরৎ সংবর্ধনা : অভিনন্দন ও প্রতিবাদ

সমাজে যশ বা খ্যাতির কেউ অধিকারী হলে দেশশুদ্ধ মানুষের দৃষ্টি পড়ে তাঁর উপর ; এক্ষেত্রে এমন একজন সাহিত্য-খ্যাতির অধিকারী শরৎচন্দ্রও ব্যতিক্রম নন। তাই ৩১শে ভাদ্র, তাঁর জন্মদিবসে দেশের বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পালা সুরু হয়। তবে শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে, জন্মদিনের এই সংবর্ধনা কোন্ সময় থেকে জুটেছিল তার কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া না গেলেও, শরৎচন্দ্রের অন্যতম জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন : '১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখাই বোধ করি সর্ব-প্রথম শরৎচন্দ্রকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন জানায়।'[১] তবে এটি জন্মদিবসের অভিনন্দন না হলেও, এই উপলক্ষে পরবর্তীকালে যে সব সংবর্ধনা সভায় তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলি যে সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকেই এই সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

অতএব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এইসব বিবরণ থেকে জানা যায়, বাংলা ১৩৩৪ সালে শরৎচন্দ্রের দ্বিপঞ্চাশতম জন্মদিবস উপলক্ষে হাওড়ার ৪৯, কালীকুমার মুখার্জি লেনে, শিবপুর সাহিত্য সংসদ আয়োজিত এক সভায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং এই উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে

১ গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫

বিভিন্ন লেখক-লেখিকাদের লেখা 'উপহার' নামে একটি স্মারক গ্রন্থও তাঁকে দেওয়া হয়।

পরবৎসর ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মদিনে দেশবাসীর পক্ষ থেকে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে শরৎচন্দ্রকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ একটি শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। দেবানন্দপুর থেকেও কয়েকজন উৎসাহী এই সভায় উপস্থিত হয়ে শরৎচন্দ্রকে এক মানপত্র প্রদান করেন।[১] এই দিন ৩১শে ভাদ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা তাঁদের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধিত করায়, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন, '...আমি আসিতে পারি বা না পারি ছেলেদিগকে আমি ভারী ভালবাসি। এই যে কতকগুলি ছেলে মিলিয়া প্রতিষ্ঠান করিয়াছে, যার নাম দিয়াছে—বঙ্কিম-শরৎ-সমিতি—যাহার বিষয় আমাদের বইয়ের আলোচনা; এই আলোচনা হইতে অন্যান্য দেশের উপন্যাস সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান জন্মিবে—তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা তোমরা সমস্ত বুঝিতে পারিবে। এই সমিতিকে আমি সমস্ত মন দিয়া আশীর্বাদ করি।'[২]

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে শরৎচন্দ্রের চতুঃপঞ্চাশতম জন্মদিবসে, পুনরায় বঙ্কিম-শরৎ-সমিতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ সভায় যোগদান করেন এবং সংবর্ধনার উত্তরে যে ভাষণ দেন তা সাহিত্য রচনার দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাওয়ার কারণে দুঃখপ্রকাশ করায় তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে ঐদিন তাঁর ভাষণে বলেন, 'কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করছ। অনেক দিনের সংস্কার, অনেক দিনের সমাজ—এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি, অভাব-অভিযোগ অনেক থাকতে পারে। বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাওনা? মানব-জীবন, সমস্ত সংসার, এতবড় পরাধীন জাতি, এসব ত রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে।

১ শরৎচন্দ্র, ১ম খণ্ড : গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ২৮৬

২ স্বদেশী-বাজার : ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮

এসব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন ? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না ? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি ?···পরাধীন দেশে কত রকম অভাব আছে—নানান দিক আছে এটা যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার করে চলেছ।'[১] শরৎচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে তরুণ সাহিত্যিকরা জবাবে বলেছিলেন যে, সাহিত্যের মধ্যে তাঁর রাজনীতি আমদানী করাটাকে তারা ভাল মনে করেনি। তাই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষণে উল্লেখ করে বললেন, 'তাঁরা অনুযোগ করলেন, সাহিত্য ছেড়ে আমি যে ওদিকে যাচ্ছি সেটা ভাল হচ্ছে না।' পরিশেষে তিনি হতোদ্যম না হযে ঐ ভাষণে তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি আবেদন জানালেন, 'এদিকটাকে অস্বীকার ক'রো না। অন্যান্য দেশের যে দু-চার খানা বই পড়েছি, তাতে দেখেছি, এ জিনিসে তারা কখনও চোখ বুজে থাকে নি। এর জন্য তারা অনেক সহ্য করেছে, অনেক শাস্তি ভোগ করেছে। তোমরা তাই কর না কেন ?'[২]

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে, চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘ তাঁদের আযোজিত এক সভায শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষণে প্রবর্তক সংঘের উন্নতি কামনা করে বলেন, 'সাহিত্য সভা হলে কিছু হযত বলতে পারতাম ?' এই বছরেই আষাঢ় মাসে শরৎচন্দ্র লাহোর গেলে, সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীরা এক সভায় তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে তিনি তাঁর নিজের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করে বর্তমান সাহিত্যের নীতি সম্পর্কে একটা আভাষ দিয়ে বলেন, '···আমাদের সাহিত্যিক নীতিটা আলাদা। সব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রকাশ পায না। কতক বাইরে থেকে বাধা এসে পড়েছে, কতক নিজেদের সৃষ্টি। যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের এই জন্য দোষ দিতে পারি না। আমারই কত গোলমাল হয়েছে। তবে ভগবানের ইচ্ছায আজ বুঝতে পারছি যে, স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে অনেক obsolete হবে তা'তে আমার কোন দুঃখ নেই। দেশের সাহিত্য, স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে পারবে।'[৩]

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায : শরৎচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ ২২৯
২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায : শরৎচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ ২৩০
৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায : শরৎচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ ২৩৬-২৩৭

একত্রিশে ভাদ্রের শরৎ সংবর্ধনা : অভিনন্দন ও প্রতিবাদ

এই বছরের ৩১শে ভাদ্র তারিখের পঞ্চ-পঞ্চাশতম জন্মদিবসে পুনরায় আমন্ত্রণ আসে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ-সমিতির পক্ষ থেকে। এই সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক চরম আকার ধারণ করে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে বহু সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন এবং বিদেশী সরকারের দমননীতি এক চূড়ান্ত রূপ নেয়। ফলে ঐদিনের সভায় শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষণে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন, 'আজ কিছু গ্রহণ করতে, কিন্তু, আমি অক্ষম। ব্যক্তিগত সম্মানের দিন এ নয়—আনন্দের এ সময় নয়। মনের এই চঞ্চল অবস্থায় কিছু বিশেষ বলাও সঙ্গত হবে না।'[১]

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কবিকে যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়—তার প্রধান একজন উদ্যোক্তা ছিলেন শরৎচন্দ্র। এই সংবর্ধনায় কবিকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তা ছিল শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রচনা। কিন্তু এই বৎসর তাঁর জন্মদিনে প্রদত্ত কোন 'অভিভাষণ' পাওয়া যায়নি। বোধ হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায়, ৩১শে ভাদ্রের জন্মদিবসে তিনি কোন ব্যক্তিগত সম্মান গ্রহণ করতে চাননি।

কিন্তু পর বৎসর—অর্থাৎ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে, খুব ঘটা-পটা করেই শরৎচন্দ্রের সপ্ত-পঞ্চাশতম জন্মতিথি পালন করার পরিকল্পনা হয়।

শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিবসে কিভাবে শরৎ-বন্দনা করা যায় তা নিয়ে, প্রিয়ংবদা দেবীর সভানেত্রীত্বে বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে আগষ্টের মাঝামাঝি নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে এক সভা আহ্বান করা হয়। সভায় এই উদ্দেশ্যে যে শরৎ-বন্দনা কমিটি তৈরী হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ হন সংবর্ধনা সভার সভাপতি। এছাড়া অন্য আরও পদাধিকারী হলেন: বাসন্তী দেবী ও প্রিয়ংবদা দেবী—সহঃ সভানেত্রী; স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত এবং জি. ডি. বিড়লা—সহঃ সভাপতি; নির্মলচন্দ্র চন্দ্র—সাধারণ সম্পাদক; শ্রীমতী লতিকা বসু ও মনীন্দ্র রায়—যুগ্ম-সম্পাদক, শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—সহঃ সম্পাদক।[২] এই কমিটির পরবর্তী বৈঠক বসে ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩২ খ্রীঃ)

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ ২৩৮

২ অমৃতবাজার পত্রিকা : ১৮ই আগষ্ট, ১৯৩২

এলবার্ট হলে (বর্তমানে যেটি কলেজ ষ্ট্রিটের কফি হাউস)। সেখানে সংবর্ধনার জন্যে একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয় এবং এই কর্মসূচীর মধ্যে থাকে, ৩১শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর) কোলকাতার টাউন হলে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত সাহিত্যিকবর্গের পক্ষ থেকে শরৎ প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এবং ঐদিন সন্ধ্যায় 'চিত্রা' ছায়াছবি গৃহে পল্লীসমাজ ছায়াছবির প্রদর্শন ; দ্বিতীয় দিনে, ১৭ই সেপ্টেম্বর টাউন হলে সাহিত্য সম্মেলন—কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ।[১] ১৮ই সেপ্টেম্বর নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাটিতে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে এক সাহিত্য-মজলিশের আয়োজন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর কোলকাতার বিভিন্ন নাট্যশালার কর্মাধ্যক্ষদের পক্ষ থেকে একত্রিতভাবে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং সেই সঙ্গে 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয়। এই সঙ্গে দেশের প্রথিতযশা নাট্য-শিল্পীদের মধ্যে শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস ব্যানার্জী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীরা এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত করেন যে, শরৎচন্দ্রের নাটকের মধ্যে রমা, চন্দ্রনাথ, ষোড়শী প্রভৃতি থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ এই উপলক্ষে অভিনয় করা হবে।

শরৎ-বন্দনা শুধু কোলকাতাতেই আর সীমাবদ্ধ থাকে না। ময়মনসিংহ, ধুবড়ী ও কোচবিহারের তরুণরাও এ বিষয়ে অগ্রণী হয়। কোলকাতায় কলেজ-ছাত্রেরা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এবং বেলেঘাটার সান্ধ্যসমিতি ও রাজা মনীন্দ্র স্মৃতি মন্দিরও সংবর্ধনা জানাতে মনস্থ করে। কিন্তু এই মহান কথাশিল্পীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় বিভিন্ন সংবাদপত্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে।[২]

এদিকে উৎসবের পূর্বেই শরৎ-বন্দনা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক মনীন্দ্রনাথ রায় ২৭/১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট থেকে ঘোষণা করলেন যে, টাউন হলে শরৎচন্দ্র সংবর্ধনা সভায় উপযুক্ত প্রবেশ-পত্র ছাড়া সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে না এবং প্রবেশ পত্রের জন্য রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডে তাঁর কাছে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। শরৎ-বন্দনা সভার কর্মকর্তাদের এই সিদ্ধান্তটি কিন্তু তরুণ সমাজের একাংশের মনোমত হয়নি। কারণ এদের অনেকেই প্রবেশ পত্র সংগ্রহে সক্ষম হয়নি। তাই

১ অমৃতবাজার পত্রিকা : ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

২ অমৃতবাজার পত্রিকা : ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

এক চাপা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং সে ক্ষোভ পরে বিক্ষোভে পরিণত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এমনই চাপা ছিল যে, এই বিষয় নিয়ে কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা যে ঘটতে পারে—তা শরৎ-বন্দনা কর্তৃপক্ষের বে' :. অসম্ভব ছিল।

তাই ১৬ই সেপ্টেম্বরের টাউন হলের সভায় এই চাপা বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই। ঘটনাটা ঘটলো, টাউন হলের কাছাকাছি রাস্তায় শরৎচন্দ্রের গাড়ী আটক করে কতিপয় তরুণ শরৎচন্দ্রকে যেতে বাধাদান করে। তাদের বলিষ্ঠ বক্তব্য হল, গত বছরে এই ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ হিজলী জেলখানায় অসহায় রাজবন্দীদের গুলি করে হত্যা করায় আজকের এই দিনটি সেই শহীদ স্মরণের দিন—হিজলী দিবস। সুতরাং যে শরৎচন্দ্রের লেখনী দিয়ে নবজাগ্রত যৌবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে—তিনি বাস্তবে কি করে যৌবনের অবমাননা করে তাঁর জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে যাবেন। বরং তাঁর জন্ম-জয়ন্তী যদি হিজলী দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হয় তাহলে বাংলার বিদ্রোহী তরুণ মন উদ্দীপিত হবে—শান্তি লাভ করবে সেই শহীদদের আত্মা।

শরৎচন্দ্র তরুণদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবর্ধনা সভার উদ্যোক্তাদের কোন কথা না শুনেই তিনি ফিরে গেলেন। কারণ শরৎচন্দ্র সে সময়ে রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন না। মন্ত্রী হলে নিশ্চয়ই সেই অবস্থায় লাঠি-গুলি চলতো এবং এতবড় সভা পণ্ড করে দেবার সমুচিত শাস্তি হিসাবে এই সব উচ্ছৃঙ্খল বালকদের জেলখানায় কুলুপ দিয়ে আটক করার ব্যবস্থা হত এবং তাঁর জন্ম-জয়ন্তীর সভায় যথারীতি ফুলের মালা গ্রহণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে সাহিত্যের ভূমিকা নিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র যে দরদী শরৎচন্দ্র; মাতৃভূমির সমস্ত ব্যথা ও দৈন্য তাঁর মনকে স্পর্শ করেছিল বলেই তিনি মানবতার দুঃখকে এমন আপন করে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই অবহেলিতদের প্রতি মর্মবেদনায় যেমন তিনি মুখর, অন্যদিকে পরাধীনতার গ্লানি মোচনে সংগ্রামরত তরুণ সমাজের প্রতিও তিনি যে একান্তই শ্রদ্ধাশীল, এই ঘটনাই তার একমাত্র প্রমাণ। শরৎ-বন্দনার সভা সেদিন হিজলী দিবস হিসাবে প্রতিবাদ সভায় রূপান্তরিত হয়।

৩১শে ভাদ্র তারিখের সভা ভুণ্ডুল করার পিছনে অন্য আর এক রাজনৈতিক

চক্রান্ত ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। এ সময়ে বাংলার রাজনীতিতে আবির্ভূত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে 'এডভান্স' দল এবং সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওয়ার্ড' দলের মধ্যে রেষারেষি চলছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন—তাই 'এডভান্স' দল এই সম্বর্ধনা সভাটিকে সুনজরে না দেখতে পারায় ভিতরে ভিতরে সভা পণ্ডের এই ষড়যন্ত্র করেছিল বলেই অনেকের ধারণা।[১]

এই সম্পর্কে নরেন্দ্র দেব তাঁর শরৎচন্দ্র গ্রন্থে লেখেন, "রাজনৈতিক হিরোওয়ারশিপের জন্য সাহিত্যরাজ্যের 'হিরো' কে তাঁর পূজামণ্ডপে যাবার পথ ছেড়ে দেওয়া হল না। 'পথের দাবী'র স্রষ্টার পূজা আয়োজন তারা সেদিন লুটিয়ে দিলে তাই পথের ধূলোয়। যাঁদের স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করে এই দক্ষযজ্ঞ ঘটলো তাঁদের আত্মা সেদিন আচার্যের অবমাননায় লজ্জিত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়।"

এছাড়া সে সময় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী অনশন করার সংকল্প করায়, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায় ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক এই শরৎ-বন্দনা অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার জন্য সংবাদপত্রে বিবৃতিও দিয়েছিলেন। এই সঙ্গে সজনীকান্ত দাসও তখন 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় শরৎ সংবর্ধনার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন।[২] ১লা আশ্বিন সেনেটহলের সভায় শরৎচন্দ্রের ভাষণ দেবার কথা ছিল। তাই টাউনহলের মুলতুবী সভা পরদিন ১লা আশ্বিনের বদলে ২রা আশ্বিন করার সিদ্ধান্ত হয়।

শরৎচন্দ্র সেনেট হলের সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে বললেন, '...দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করছে, সে ভবিষ্যৎ যে কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় না, তোমাদের পানে তাকিয়ে দেশের লোক যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে।'[৩]

১ শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড), গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ২৮৭

২ শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড), গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ২৮৮

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী,' পৃঃ ২৭২

২রা আশ্বিন টাউন হলের শরৎ-বন্দনা সভায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু সাংসারিক দুর্যোগবশতঃ তিনি সভায় উপস্থিত হতে না পারার অক্ষমতা জানিয়ে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং কবির লেখা 'কালের যাত্রা' নামক নাটিকা শরৎচন্দ্রের এই জন্মদিনে উৎসর্গ করা হয়। এই উপলক্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এক শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। টাউন হলের এই সম্মাননা সভায় শরৎচন্দ্র তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন; সংসারে অনেক কিছুর মতো মানব-মনেরও পরিবর্তন আছে; সুতরাং আজ যা বড়, আর একদিন তাই যদি তুচ্ছ হয়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সে-দিন আমার সাহিত্য-সাধনার বৃহত্তর অংশও যদি অনাগতর অবহেলায় ডুবে যায়, আমি ক্ষোভ করব না। শুধু, মনে এই আশা রেখে যাব অনেক কিছু বাদ দিয়েও যদি সত্য কোথাও থাকে সেটুকু আমার থাকবে। সে আমার ক্ষয় পাবে না। ধনীর অজস্র ঐশ্বর্য নাই বা হ'ল, বাক্‌দেবীর অর্ঘ্য-সম্ভারে ঐ স্বল্প সঞ্চয়টুকু রেখে যাবার জন্যই আমার আজীবন সাধনা।[১]

এই সময়ের বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেখা যায়, এবছরের ৩১শে ভাদ্র তারিখে হুগলীর দেবানন্দপুরে ও যশোহর জেলার দীঘালিয়া সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে।

এরপর ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৫শে আশ্বিন; রবিবাসরের উদ্যোগে বেলেঘাটার প্রফুল্লকাননে যে শরৎ সংবর্ধনা সভা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে স্বরচিত একটি মানপত্র পাঠ করেছিলেন—যার ফলে শরৎচন্দ্র খুবই আনন্দিত হন এবং তাঁর উপর নানাকারণে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ মুছে যায়।

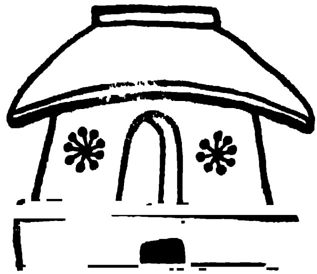
ঐ বঙ্গাব্দেই ৩রা আশ্বিন শনিবার, শরৎচন্দ্রের একষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে হাওড়াবাসীর পক্ষ থেকে হাওড়া টাউন হলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র হাওড়ায় তাঁর সাহিত্য সাধনার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর সাহিত্যে মুসলমান সমাজজীবনের চিত্র তুলে ধরবেন বলে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা যতই মুসলমান সম্প্রদায়কে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া মনে করিনা কেন, মুসলমানগণ আমাদেরই প্রতিবেশী, বাংলা

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী', পৃঃ ২৭০-৭১

ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা। সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়া যদি তাহাদের সহিত কথা বলি, তবে তারা শুনিতে বাধ্য, কারণ তারাও ত মানুষ।'

শরৎচন্দ্র এরপর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডের নবনির্মিত ভবনে গৃহ-প্রবেশ করেছেন। পরের বৎসরগুলিতে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে বিভিন্ন সভায় তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে বটে, কিন্তু তার উত্তরে তিনি এমন কোন অভিভাষণ দিয়েছিলেন কিনা—তার বিবরণ সে সময়ের কোন পত্র পত্রিকায় পাওয়া যায় না। তবু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসর অর্থাৎ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র তারিখে তাঁর দ্বি-ষষ্টিতম জন্মদিনে স্কটিশচার্চ কলেজের 'বাংলা সাহিত্য সমিতি' এবং বিদ্যাসাগর কলেজ অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। এই বৎসর ১৫ই আশ্বিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের 'তারা স্পোর্টিং ক্লাব' তাঁকে যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে, মনে হয় সেই হয় তার শেষ সংবর্ধনা সভা, যে সভায় প্রদত্ত মানপত্রটির রচয়িতা ছিলেন কবি নজরুল।[১]

১ শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড) : গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ২৯৩-২৯৪



শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা ঃ
শত্রু ওরফে মিত্রদের গ্রাম্য উদ্যোগ

অবশেষে একদিন বাংলার মরমী কথাশিল্পীর কণ্ঠ এসে থামল শেষ বিন্দুতে। কালের অমোঘ গতিতে দেহবন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি ঘটলো, কোলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্র তিরোহিত হলেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী। তখন তাঁর বয়স ৬১ বৎসর ৪ মাস। দেশব্যাপী চললো ক্রন্দনরোল। পরবর্তী করণীয় কার্যের তাগিদে বাণীর বরপুত্রের শোকে অনুষ্ঠিত হল স্মৃতিসভা আর শোকাঞ্জলি। সেজন্যে শত্রু-মিত্র আর পক্ষ-বিপক্ষের সমাবেশ ও সভা সমিতি থেকে নিবেদিত হল কথাশিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। মুহ্যমান হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিককালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।'

হরিপুরা কংগ্রেসে নির্বাচিত সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, 'সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।'

সুতরাং কোলকাতা তথা অবিভক্ত বাংলার বুদ্ধিজীবী জগতের সর্বত্রই উচ্চারিত হল সাহিত্য জগতের অপূরণীয় ক্ষতির ফিরিস্তি, আর সেই সঙ্গে শোকপ্রস্তাব। কিন্তু সে শোকপ্রস্তাবের মর্মবেদনা তার একান্ত অন্তরঙ্গ প্রিয়জন 'কিছুই জানিল না, কি আছে তাহাতে'। কারণ শরৎসাহিত্যের নারীদরদীরা

চোখের জল ফেলে চললেন তাঁর বিয়োগ বেদনায়, কিন্তু গৃহকোণে সবার অলক্ষ্যে যিনি ঘর-গৃহস্থালীর অন্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে কথাশিল্পীর জীবন যন্ত্রণার অংশীদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হয়ত সে সময় এদের চোখে হয়ে পড়েছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয়। তাই তিনি এইসব শোক প্রস্তাবের মর্মবাণী গ্রহণ করার অধিকারী হবার যোগত্য অর্জন করতে পারেন নি। স্বভাবতই এমন সব চোখ ধাঁধানো শরৎ স্মৃতিসভার ঘটা-পটা অনুষ্ঠানের ঢক্কানিনাদিত বিজ্ঞাপনের বহু খবরই এসে পৌঁছোয়নি তাঁর সহধর্মিণী হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে।

সেসময়ে সাহিত্যানুরাগীদের শোকসভার এমন 'আহা-মরি' বিবরণ থেকে আমরা সরে আসতে চাই তার বার্ধক্যের বারাণসী সামতাবেড়েতে। যে অখ্যাত পল্লীগ্রামে একদিন তিনি ঘর বেঁধেছিলেন এবং মনের অনেক আগ্রহ অনেক কৌতুহল দমন করতে না পেরে অনেকদিনই ছুটে গিয়ে যাদের মধ্যে থেকে বহু দুঃখ ও দৈন্যের অংশীদার হয়েছিলেন—সেই গ্রামের জনগণ তার স্মৃতিতর্পণে এবং স্মৃতিরক্ষায় কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে জীবনী-অন্বেষণকারীদের মধ্যে কেউ কি সেই স্মৃতি শ্রদ্ধার্ঘ্যের সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন? শরৎ জীবনী-গ্রন্থকাররা দেখিয়েছেন যে তাঁর এই পল্লীজীবনে তিনি প্রথমদিকে শান্তিতে কাটাতে পারেননি। সে সময়ে একদিকে যেমন ছিল গ্রাম্যজীবনে দিনযাপনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর রেষারেষি, অন্যদিকে তার উপরে ছিল গ্রাম্য রক্ষণশীল সমাজপতিদের নানান শাসন-পীড়ন এবং সেই কলঙ্কে ও নিন্দাপঙ্কের মধ্যেই ছিল তার দৈনন্দিন জীবন।

অতএব শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে সামতাবেড়, মেল্লক ও পাণিত্রাসের গ্রামবাসীগণ আদৌ তাঁকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন কিনা—এমন দ্বন্দ্ব-সংশয়ের মধ্যে পড়ে তাঁর জীবনীকাররা এ বিষয়ে কোন খোঁজ-সন্ধানের প্রয়োজনও অনুভব করেনি। কিন্তু এই গ্রাম্য জীবনে একদা যাঁরা হয়ত তাঁর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন বা যাঁরা ছিলেন তাঁর পরম সুহৃদ, তাঁরা এই এলাকায় শরৎস্মৃতি রক্ষায় যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা আজ শরৎ-শতবার্ষিকীতে একান্তই স্মরণ করা যেতে পারে। তবে সেদিনের স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে যাঁরা একান্তই উদ্যোগী হয়েছিলেন, আজ তাঁরা স্থানীয়ভাবে এইসব শতবার্ষিকী উৎসবআলাদের

কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে পড়েছেন। কোন পত্র-পত্রিকায় সেজন্য তাঁরা কীর্তিত হন না বা, খবরের কাগজে তাঁদের আলোকচিত্রও মুদ্রিত হয় না। পরিবর্তে শরৎ শতবার্ষিকী পর্যায়ে এইসব আসল উদ্যোক্তাদের এড়িয়ে গিয়ে নানান বিভ্রান্তিকর জবানবন্দী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। তাই হালফিলের এইসব শরৎ-জীবনীকার ও অধুনা শরৎ-গবেষকদের কাছে স্বভাবতই এ প্রশ্ন রাখা যেতে পারে যে, সেদিনের শরৎ স্মৃতি রক্ষায় যারা উদ্যোগী ছিলেন এবং যাঁরা এখনও জীবিত, তাঁদের কাছ থেকে জীবন স্মৃতির তথ্য সংগ্রহ না করে, পক্ষপাতী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কেন বিভ্রান্তিকর তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ?

এই অঞ্চলে প্রথম শরৎ স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় পাণিত্রাসের শিবতলা প্রাঙ্গনে। আহ্বায়ক হিসাবে প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষাল। এই সভা আহ্বান করে যে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল তার পুরাণো সংখ্যা এখনও শ্রী ঘোষালের হেপাজতে রক্ষিত আছে। সাধারণের অবগতির জন্যে প্রচারপত্রটির বয়ান নিয়ে দেওয়া গেল : "স্মৃতি

বার্ষিকী /আগামী ১৪ই মাঘ ইং ২৮শে জানুয়ারী রবিবার বেলা ২ ঘটিকার সময় বাংলার সর্ব্বজনপ্রিয় কথাশিল্পী ৺শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য পাণিত্রাস শিবালয় প্রাঙ্গণে তৃতীয় বাৎসরিক স্মৃতি সভার অধিবেশন হইবে। পাণিত্রাস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, সর্বসাধারণের উপস্থিত প্রার্থনীয়। ১০ই মাঘ ১৩৪৬ সাল। / নিবেদক— / শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষাল। / পাণিত্রাস / স্থান—পাণিত্রাস শিবালয় প্রাঙ্গন। / সময়—বেলা দুই ঘটিকা। / ধনঞ্জয় প্রেস—কল্যাণপুর, হাওড়া।"

সে যাই হোক্, সেদিনের এই সভা সম্পর্কে ড: প্রতাপচন্দ্র গুহরায় সম্পাদিত 'মাতৃভূমি' (৩/২/১৯৪০), 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' (৪/২/৪০ এবং ৭/২/৪০), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'আনন্দবাজার' (৭/২/৪০), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'দৈনিক বসুমতী' (৩/২/৪০) প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, পাণিত্রাস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায়

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্থানীয়ভাবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন : ললিতকুমার পাকড়াশী, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশচন্দ্র চ্যাটার্জী, বোমকেশ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মোহিতকুমার পাকড়াশী, পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুড়ে, কেদারনাথ দত্ত, ডাঃ চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পঞ্চানন ঘোষাল, ডাঃ রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ আচার্য, রাসবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

আলোচ্য সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পাণিত্রাসে একটি শরৎ স্মৃতি হল নির্মাণের এবং শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দপুরে একটি বিধবা-আশ্রম স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুতরাং পরিকল্পনাটিকে রূপ দেবার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়, সেই কমিটির পদাধিকারগণের মধ্যে ছিলেন : শ্রীনরেন্দ্র দেব (কলিকাতা)—সভাপতি ; মনিমোহন রায় (বেহালা) ও শ্রীললিতকুমার পাকড়াশী (কলিকাতা)—সহঃ সভাপতি ; শ্রীঅবিনাশ ঘোষাল (সম্পাদক : বাতায়ন) ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষাল (পাণিত্রাস)—যুগ্ম সম্পাদক ; শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সামতা)—সহঃসম্পাদক ; শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সামতাবেড়), শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র (কল্যাণপুর), শ্রীহরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য (পাণিত্রাস), শ্রীব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), ডাঃ মোহিতকুমার পাকড়াশী (কলিকাতা), শ্রীমনিমোহন চক্রবর্তী (উকিল : আলীপুর), শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় (গোবিন্দপুর), শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল (উকিল : উলুবেড়িয়া, গ্রাম গোবিন্দপুর), ডাঃ রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পাণিত্রাস), শ্রীকেদারনাথ দত্ত (পাণিত্রাস), শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষাল (মেল্লক), শ্রীহর্ষকুমার রায় চৌধুরী (মেল্লক), শ্রীযুক্তবিনোদবিহারী ঘোষাল (সামতা), শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র মুখার্জি (সামতা), শ্রীপুলিনবিহারী মান্না (বিরামপুর), ডাঃ চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় (নাউপালা), শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত (দেবানন্দপুর), শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুড়ে (টেঁপুর), মৌলভী মজাফফর হোসেন (কল্যাণপুর), মৌলবী আবদুল সত্তার (কল্যাণপুর), শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী (সামতা), শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মজুমদার (দেউলগ্রাম), শ্রীমোহিনীমোহন ঘোষাল (মেল্লক), শ্রীজানকীজীবন চক্রবর্ত্তী (সামতা), শ্রীরাসবিহারী

গাঙ্গুলী (পাণিত্রাস), শ্রীপঞ্চানন দীর্ঘাঙ্গী (সামতা), শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাণিত্রাস)—সভ্যবৃন্দ।

এই সভায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গদের অংশ গ্রহণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী হিসাবে নানান কারণে ও নানান বিষয়ে শরৎবাবুর উপর প্রাথমিক পর্যায়ে কোন মনান্তর বা মতান্তর থেকে থাকলেও, শরৎ স্মৃতি রক্ষায় তাঁরা যে অভিমানবশতঃ বা রোষবশতঃ পিছিয়ে থাকেন নি—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি তারই এক বড়ো প্রমাণ।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি সভা পাণিত্রাসের শিবতলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে পাঠক সাধারণের মধ্যে যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় যে, পাণিত্রাস গ্রামের জনসাধারণ ছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনসাধারণের কোন ভূমিকা বোধ হয় ছিল না। আসলে সে সময়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মধ্যস্থল হিসাবে পাণিত্রাসের শিবতলা প্রাঙ্গনে সভা আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। স্মৃতি সভার প্রসঙ্গে এই বিষয়টি উথাপন করার পক্ষে আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। সে কারণটির মূল বক্তব্য হল, সম্প্রতিকালে শরৎচন্দ্রের জীবনীকাররা বেশ কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন যে, তিনি পাণিত্রাসের অধিবাসী ছিলেন—সামতাবেড়ের নয়।[১]

১ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, অধুনা প্রকাশিত 'অমৃত' সাপ্তাহিকের 'শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা ঃ ১৯৭৫'। এতে প্রকাশিত 'পাণিত্রাসে শরৎচন্দ্র/স্মৃতিচারণ ঃ সাক্ষাৎকার' এবং 'শরৎচন্দ্র নিকট আত্মীয়ের চোখে' নামক দুটি প্রবন্ধে লেখক শরৎচন্দ্রের বাসভবনের ঠিকানা বা সাকিম সম্পর্কে প্রায় বাইশ বার উল্লেখ করেছেন পাণিত্রাস এবং পরে সামতাবেড় কথাটি জুড়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সোজা কথায় 'পাণিত্রাস-সামতাবেড়।' ঐ প্রবন্ধে বার বার বোঝানো হয়েছে যেন শরৎবাবুর বাসভবন কোনকালেই সামতাবেড় ছিল না—ছিল পাণিত্রাস-সামতাবেড়। তাই উল্লেখিত লেখাটির শিরোনামা দেওয়া হয়েছে 'পাণিত্রাসে শরৎচন্দ্র...', এবং প্রস্তাবনার সুরুতেই বলা হয়েছে, 'পাণিত্রাস-সামতাবেড় গ্রাম কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল শেষ বয়সের আশ্রয়...।'

কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধ লেখকের উক্তি যে কত অসত্য তার প্রমাণ মিলতে পারে ঐ একই প্রবন্ধের ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত পারুলতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা শরৎবাবুর চিঠির 'ফটোষ্টাট' প্রতিলিপিতে। ঐ চিঠির ঠিকানা স্থানে স্পষ্টই লেখা আছে ঃ 'সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোঃ/জেলা হাবড়া'। এখানে সামতাবেড় গ্রামের পোষ্ট অফিস পাণিত্রাস অর্থাৎ যেটির উল্লেখ ডাক চলাচলের জন্যে একান্তই প্রয়োজনীয়। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের লিখিত যে সব চিঠিপত্র এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে, তাতে

সে যাই হোক, সেসময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে গঠিত এই শরৎস্মৃতিরক্ষা কমিটি পরবর্তী অধ্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করার জন্য কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তা অবশ্য জানা যায়নি। তবু এই অঞ্চলে স্মৃতিসভার মাধ্যমে এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য যে সিদ্ধান্ত এখানকার জনসাধারণ গ্রহণ করেছিলেন তা কার্যকরী না হলেও, একান্তই অভিনন্দনযোগ্য। পাণিত্রাস শিবতলার এ সভায় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত দেবানন্দপুরের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিনে শরৎস্মৃতি রক্ষায় উদ্যোগী ব্যক্তিদের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত আছেন।* সুতরাং বর্তমানের শরৎজীবনী গ্রন্থকারদের উচিত এ বিষয়ে শরৎসান্নিধ্যধন্য ঐ সব জীবিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা। তা না করলে, শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিমানস সম্পর্কে বহু মনগড়া ও আজগুবী কাহিনী স্থানীয় জীবনী লেখকদের পিতা বা ভাগ্নে কিংবা আত্মীয়স্বজনদের জবানবন্দিতে প্রকাশিত হয়ে ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে।

১৯৪০ সালে শরৎস্মৃতি রক্ষায় উদ্যোগীরা পাণিত্রাস-শিবতলায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, বলা বাহুল্য তা কার্যকরী না হলেও সামতা গ্রামের উৎসাহীদের প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষায় এখানে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়। এতদঞ্চলের স্থানীয় গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্রের নামে দেউলটি থেকে মেল্লক গ্রামের নদীর বাঁধ পর্যন্ত একটি পীচঢালা রাস্তাও নির্মিত হয় এবং পাণিত্রাস গ্রামে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষায় 'শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র পুস্তকই এই গ্রন্থাগারের একমাত্র সম্পদ নয়, এখানে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত কিছু দ্রব্যাদি, স্বলিখিত চিঠিপত্র ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিও এই গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য এক সংগ্রহ।

এ ছাড়াও শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে প্রতিবৎসর স্থানীয়ভাবে

সর্বত্রই গ্রাম হিসাবে সামতাবেড এবং সেই সামতাবেড গ্রামের ডাকঘর হিসাবে পাণিত্রাসের উল্লেখ রয়েছে। এমন কি 'অমৃত' পত্রিকার ঐ বিশেষ শরৎ-শতবার্ষিকী সংখ্যার ১২, ১৪, ১৭, ২০, ২৮, ১১৮ ও ১২০ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রগুলিতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্র কোনদিনই পাণিত্রাসের বাসিন্দা হিসেবে উল্লেখ করেননি, বরাবরই করেছেন সামতাবেড়।

শরৎ জয়ন্তী উৎসব অনাড়ম্বরভাবে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে এবং সে উৎসবে হিরন্ময়ী দেবীও অনেক সময় অংশ গ্রহণ করেছেন (পরিশিষ্ট : গ দ্রষ্টব্য)।

ইংরেজী ১৯৬০ সালে হিরণ্ময়ীদেবীর মৃত্যুর পর স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়, শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাসভবন সরকারী দখলে এনে এখানে একটি 'পার্সোনেলিয়া মিউজিয়ম' গড়ে তোলা হোক্।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই বাসভবন সরকারী অধিকারে আনার জন্যে যে উদ্যোগ দেশবাসীর পক্ষে গ্রহণ করা উচিত ছিল, তা হয়নি। অন্যদিকে সরকারী উদ্যোগ আয়োজন এতদিন যা কিছু করা হয়েছে—তা সবই দেবানন্দপুরের জন্যে। কারণ সে সময়ে এই রাজ্যের মন্ত্রীসভার মধ্যে যাঁরা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখতেন তাঁরা ছিলেন 'হুগলী গ্রুপের' অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সেসময়ে দেবানন্দপুর-এর 'পাবলিসিটি'র সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শরৎস্মৃতি রক্ষার নানান আয়োজন হয়। সামতাবেড়েতে শরৎস্মৃতি রক্ষায় উদ্যোগীদের তৎপরতা সে তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ থেকেই যায়।

১৯৬৯ সালে ৬নং জাতীয় সড়কের প্রয়োজনে রূপনারায়ণ নদের উপর নবনির্মিত সেতুটি সবেমাত্র যান-বাহন ও সাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। ঠিক এই সময় শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীঅজয়কুমার মিত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এক পত্র প্রকাশ করে অবগত করালেন, 'রূপনারায়ণ নদের উপর নির্মিত সেতু দিয়ে যান-চলাচল আরম্ভ হয়েছে। এই সেতুটি যে স্থানে অবস্থিত সেখান থেকে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীগৃহ খুব কাছে। বাংলাদেশে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে কোন মতভেদ থাকতে পারে না বলেই মনে হয়। এ সেতুটির নাম "শরৎ-সেতু" রাখা হোক্। শরৎচন্দ্র এককালে তাঁর "ছেলেবেলার গল্পে" কোলাঘাটের রেল-সেতু নির্মাণের সময়ের উল্লেখ করেছেন।... নবনির্মিত সেতুটি "শরৎ-সেতু" নাম দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।"

মিত্র মশায়ের এই চিঠি প্রকাশিত হবার পর, স্থানীয়ভাবে শরৎ স্মৃতি রক্ষায় উদ্যোগীদের মধ্যে একটা সাড়া জাগলো। গঠিত হল 'হাওড়া জেলা শরৎ স্মৃতি রক্ষা কমিটি' এবং এর কার্যালয় হ'ল আনন্দনিকেতন-এ। শরৎচন্দ্রের অবহেলিত এই বাসভবনটিকে যথাযোগ্যভাবে সংরক্ষণের দাবীতে কমিটির পক্ষ থেকে

বিভিন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাক্ষরিত একটা আবেদনপত্র প্রচার করা হল—যার পরিশেষে বিবৃত হয়েছে : 'তাই আজ পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবী কর্মী এবং সর্বোপরি পশ্চিমবাংলার দেশপ্রেমিক জনসাধারণের নিকট এক মহান আবেদন এসে হাজির হয়েছে—শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাসভবনটিকে সরকারী পুরাকীর্তি আইন অনুযায়ী অবিলম্বে অধিকার করা হোক এবং এই ভবনটিকে সংস্কার করে অবিলম্বে এটিকে জাতীয় সংগ্রহশালা এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক্। জাতির সামগ্রিক স্বার্থে, জাতীয় জীবনের অগ্রগতির প্রযোজনে আজ আমরা সরকার ও দেশবাসীর নিকট সেই আবেদনই উপস্থিত করছি। (স্বাঃ) শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অমিতাভ চৌধুরী, ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচ্চন, রমাপদ চৌধুরী, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী এবং অমল গাঙ্গুলী (সভাপতি, হাওড়া জেলা শরৎচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি)।'

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে তখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের রাজত্ব। এ সময়ে ঐ মন্ত্রীসভায় পূর্তমন্ত্রী ছিলেন শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) দপ্তরের হাতে ছিল পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার দায়িত্ব। তাই মন্ত্রী মহোদয় নবগঠিত জেলা স্মৃতিরক্ষা কমিটির আমন্ত্রণ পেয়ে ঐ বছর ২০শে জুলাই তারিখে সামতাবেড়ের বাসভবন পরিদর্শনে এলে স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যে দাবীপত্র উপস্থাপিত করা হয়, সেই দাবীপত্রের সারাংশ হল : (১) সরকার কর্তৃক সামতাবেড়ের বাসভবনের অধিকার অর্জন এবং তথায় সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন (২) দেউলটি ষ্টেশন থেকে শরৎচন্দ্রের বাসভবন পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ এবং (৩) রূপনারায়ণের উপর ব্রীজের 'শরৎ-সেতু' নামকরণ।

পূর্তমন্ত্রী শরৎচন্দ্রের বাসভবন পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ ও ব্রীজের নামকরণ সম্পর্কে তখনই ঘোষণা করলেন যে, সরকারী উদ্যোগে এই কাজগুলি সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেওয়া হবে। তবে শরৎচন্দ্রের বাসভবনের অধিকার অর্জনের বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীন হওয়ায় ঐ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এই সঙ্গে তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আইন অনুযায়ী এই ধরণের কোন বাসভবনের 'এক্যুইজিশন' করতে গেলে আগে মালিক পক্ষের সঙ্গে 'নিগোসিয়েশন' চালাতে হবে। সুতরাং মন্ত্রীমশায়ের নির্দেশমতই হাওড়া জেলা শরৎচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষে সভাপতি অমল গাঙ্গুলী ১৮/৮/১৯৬৯ তারিখে শরৎচন্দ্রের এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণকে এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার প্রার্থনা জানিয়ে একটা পত্র দিলেন।

ঐ বছরেই ৩১শে ভাদ্রের শরৎ জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে রূপনারায়ণ ব্রীজের নামকরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত বিভাগের পক্ষ থেকে এক জনসভা আহূত হয়। ব্রীজের পাদদেশে নাউপালা খেলার মাঠে আয়োজিত এক বিরাট জনসমাগমে ভাষণ দেন: শরৎ স্নেহধন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। সভাশেষে সেতুগাত্রে "শরৎ-সেতু" নামকরণের শিলান্যাস করেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত বহু কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকগণও এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। এরপর সেদিন থেকে রূপনারায়ণ সেতুর নতুন করে নামকরণ হয় 'শরৎ-সেতু'।

এদিকে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হিসাবে কোলকাতার ২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড থেকে শ্রীঅমলকুমার চ্যাটার্জি, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ তারিখে রেজিষ্ট্রি-ডাকযোগে জেলা স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি অমল গাঙ্গুলীকে যে পত্র প্রেরণ করেন, তা হল :

"Dear Mr. Ganguly,

With reference to your letter of the 18th ultimo, I am to state that "being brought up in the glorious tradition of this great patriot writer", I know better than you that Sarat Chandra is a great man and his celebrated abode is full of his hallowed memory. So, I have kept the premises in

extremely good condition by embellishing the house with its flowery garden, beautiful ramparts and well-designed ponds which no Government will be able to do. I have also engaged servant and gardener to keep it always neat and clean. But, it is a great regret that on the occasion of your last meeting in my house with Honourable Minister Mr. Subodh Banerjee in the Chair, you distributed a pamphlet in which you have given publicity of a big lie viz. after the death of Sm. Hiranmayi Devi, the house has been left uncared and it is going to ruins and you have published a very old photograph perhaps after the cyclone in support of your malicious purpose. But, if you are true, if you are sincere, then say, what you have seen about the house on that meeting-day, and the contents of the pamphlet, are alike ? Certainly, your conscience will not respond, rather it will rebuke you. But, still the move has been taken by you and your retinue only to render the above house into your parlour or "Addakhana".

Your statement that "there has been a move to the Govt. of west Bengal" and "the State Govt. is seriously contemplating on taking over" etc. is a downright falsehood. The Honourable Minister Mr. Subodh Banerjee publicly announced on that meeting that the Government has no intention of taking over this house. So far he can assure the meeting that the Rupnarayan bridge will be designated in the name of Sarat Chandra ; and a road from Deulti-Station to this house will be made metalled.

As regards personalia museum, we are already running that from long ago. But, mere used material belongings are not the whole of Sarat Chandra. His living relatives are also essential to have a ture and complete knowledge of him. So, we are integral part of this house. Sarat Chandra had unbounded love for us. He always wanted us habilitated and a roof over our head. With that view he made the impo-

rtant Will. By virtue of which we are ever in-charge of this house and his whole property. But on the pretext of paying homage to him, if you move in this direction out of vengeance, you will be going against his Will. And the great soul will curse you and will never rest in peace.

Referring your "Cultural institution" we burst into loud laughter. Are these sponsors living in utopia ? In these remote villages where people are starving and the literacy of alphabets only is twenty percent, how these protagônists are running after a mirage of cultural institute. Let the people have attain a certain high standard to imbibe Sarat-Culture. And that requires many decades.

About your research that you have said with allurement in your pamphlet, I should say, at present research on his works can be executed. And University-Library, National Library etc. are the best places where Sundry books for reference can be obtained under the guidance of erudite professors. But, the research on Sarat Chandsa as man is not opportune now on temporal considration. Many of his friends and relatives are still living with a history of him. Let Centuries glide by. And there should prevail legends on Sarat Chandra like Kalidas and Chandidas. And then let the research students sit at Bhagalpur, at Devanandapur and at Samtaber-house to discover which place can claim Sarat Chandra in which respect.

If your sponsoring body in very eager to do a noble deed, I hereby advice, let it devote its energy in raising a worthy memorial of Bankim Chandra. His celebrated house on Pratap Chatterjee Street is truly urcared and neglected, and is really going to ruins. Let the sponsoring committee concentrate all its might to furnish a fitting memorial of Bankim Chandra, whose memorial is primary. Bankim Chandra is greater and predecessor of Sarat Chandia.

I have seen your good gesture in the letter. But, why are you contrary in action ? You convened the meeting in

my house without my permission. Is it not trespass ? Have you not committed a crime thereby ? Moreover, have you not a bit of chivalry and courtesy ? Why didn't you send me a copy of your pamphlet for my perusal ? Because, it was full of lies. And you performed your misdeed clandestinely.

Now, I ponder with deep anguish that the fathers and grand-fathers of these sponsors once ex-communicated Sarat Chandra, and the ancestral blood is flowing in the veins of these offsprings for another mischief-making.

In reply to your statements, "a favourable response from your end", "it is obvious that your sympathy and co-operation can not be wanting" etc., I am asking you – you are trying to oust me from my house and I shall co-operate you ? Do you regard me as a nitwit and nincompoop ? I shall fight tooth and nail to eradicate this nefarious design and thereby shall respect and immortalise the Will of the great writer.

I again emphatically assure you I shall keep up this house with its surroundings in best condition—having aesthetic appreciation and solemnity which no Government and any private concern will be able to maintain.

Whenever, any lover of Sarat Chandra will come to visit this celebrated house and to pay his homage to the great author, he is always welcom here."

অতএব এ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে 'always welcome here'-বলা হলেও বাসভবনের গেটে তালাবন্ধ প্রায়ই থাকে ; অনেক সময় দর্শকদের মান-মর্যাদার উপর নির্ভর করে তালা খুলে দেওয়া হবে, কি হবে না। শরৎ তীর্থের এই বাসভবনের মধ্যে প্রবেশাধিকার না পেয়ে এমন বহু উৎসাহীদের যে ফিরে আসতে হয়েছে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এতসব সত্ত্বেও সামতাবেড়ের বাসভবন সরকার দখল অর্জন ক'রে এখানে একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়ে তুলুক—এ দাবী কিন্তু সোচ্চার হতে থাকে। অবশেষে

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা :

১৯৭৫ সালে পাণিত্রাসে শরৎ জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে আহূত সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করেন—শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাসভবন সরকারী অর্জনের মধ্যে আনা হবে। তাই পরবৎসর বাগনানে অনুষ্ঠিত তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বৈঠক থেকেও ঐ একই কথা সাধারণ্যে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তার পরেও মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ঘুরে চলেছে এবং সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতিদানকারী মন্ত্রিসভাও বিদায় নিয়েছেন, বদলে এসেছে নতুন বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। কিন্তু সামতাবেড়ের বাসভবন সরকারী দখলে আনার ব্যবস্থা সম্পর্কে কি অগ্রগতি হয়েছে তা জনসাধারণ আজও জানতে পারেনি ; তবে বর্তমান এই বাসভবনের মালিকানা সাব্যস্ত নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে মামলা-মোকদ্দমা চলছে, সে সম্পর্কে এই অঞ্চলের জনসাধারণ সুবিদিত। এখন শরৎস্মৃতি রক্ষায় সরকারী প্রচেষ্টার এই লাল-ফাঁস টেবিল থেকে টেবিলে ঘোরাঘুরি করে, কবে যে তার বন্ধন মুক্তি ঘটাবে—তারই প্রতীক্ষায় জনসাধারণ দিন গুণে চলেছে।

পরিশিষ্ট ঃ

(ক)

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক-তালিকা ঃ

(* চিহ্নিত পুস্তকগুলির অংশ-বিশেষ দাগ চিহ্নিত এবং তারিখ সহ স্বাক্ষরিত পুস্তকগুলির পরিচয় বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত।)

গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটক (ইংরাজী)

* Benavente, Jacinto—Plays-2nd Series: New York, 1923.
  —Plays-3rd Series.
  —Plays–4th Series.
  (signature and date 2. 8. 23)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯২৫ সালে নাট্যকার স্পেন থেকে কবি দিনেশ দাসের সঙ্গে পত্রালাপ ক'রেছেন।

* Bojer, Johan—The Great Hunger: London, 1922.
  (signature and date 30th. June, 1922.)

Brienx—Woman On Her Own, False Gods and The Red Role: Three Plays (The English versions by Mrs. Bernard, Shaw, J. F. Fagan and A. Bernard Miall): London, 1916,
(signature and date 11.2.21.)

Cockton, Henry—Valentine Vox & The Ventriloquist.

Dickens, Charles—The works of Charles Dickens: London, 1938.

" Vol. II—The Posthumous Papers of the Pickwick Club.

" Vol. III—The Adventures of Oliver Twist & A Child's History of England.

Dickens Charles—The Works of Charles Dckens.

„ Vol. IV—The Life and Adventures of Nicholas Nickleby.

„ Vol. V—The Old Curiosity S'.‹›p & Master Humphrey's'clock.

„ Vol. VI—Barnaby Rudge.

„ Vol. VII—The Life and Adventures of Martin • Chuzzleurt.

„ Vol. VIII—Dombey and Son.

„ Vol. IX—The Personal History Of David Copperfield.

„ Vol. X—Christmas Books & Reprinted pieces.

„ Vol. XI—Bleak House.

„ Vol. XII—Little Dorrit.

„ Vol. XIII—A Tale Of Two Cities & The Uncommercial Traveller.

„ Vol. XlV—Great Expectations, The Lazy Tour Of Two Idle Apprentices ; Hunted Down ; Holiday & Romance George Silverman's Explanation.

„ Vol. XV—Our Mutual Friend.

„ Vol. XVI—The Mystery of Edwin Drood & Hard Times.

„ Vol. XVII—Christmas Stories.

„ Vol. XIII—American Notes ; Pictures From Italy & Contribution to "The Examinar."

„ Vol. XX—Charles Dickens, by George Gissing ; Dickens Land by J. A. Nicklin ; Dictionary of Characters, Places etc. in the Novels & Stories.

„ —Sketches by Boz.

Dostoyevsky—Crime And Punishment : London.
(signature and date 17.8.20.)

Dumas, Alexandre—The Black Tulip : London.

—The Lady With The Camelias : London.

France, Anatole—The Red Lily : London.

Gorki, Maxim—The Orloof Couple And Malva : London, 1901. (authorized translation from Russian by Emily Jakowleff & Dore B. Montefiore)
(signature and date 7. 21.)

„ —A Nights Lodging : Boston, 1920.
(signature and date 17.8.20.)

—In The World : London.

Ham Sun, Knut—Growth Of The Soil : London.
(signature and date 21.4 22.)

—Hunger : London, 1921.
(signature and date 10/22)

Hutchinson, A.S.M.—If Winter Comes : London.
(signature)

Ibanez, Vicente Blasco—The May Flower—A Tale Of The Valencian Sea-Shore (translated from Spanish Arthur Livingston) : London.
(signature and date 10.1,23.)

Lagerlof, Selma—The Outcast : London.
(signature and date 22.7.22.)

Maran, Rene—Batouale (A Negro Novel From The French) : London, 1921.

Marrion, I—Tillers Of The Ground : London, 1911.

Pope, Alexander—The Poetical Works : London.

Sudermann, Hermann—The Song Of Songs (Das Hore Lied) : New York, 1908. Translated by Thomas Seltzer.
(signature and date 20.4.22.)

Tagore, Rabindranath—The Golden Book Of Tagore.
(signature in ink and date 7th March 1932)

Tolstoy, Leo—Resurrection (translated by Louise Mande) : London, 1910.

—The complete works of Tolstoy : New York.
—Anna Karenina, Vol. I & II.
(signature and date 1.26)

Tolstoy, Leo—The Complete Works.
—Master And Man ; The Kreutzer ; Sonata & Dramas.
(signature and date 1.26)
—The Long Exile and Other Stories.
(signature and date 1.26)
„ The Life Of Count Tolstoi.
(signature)
„ A Russian Proprietor ; The Death Of Ivan Ilyitch and Other Stories.
(signature and date 1.26).
„ My Confession ; My Religion & The Gospel In Brief.
(signature and date 1. 26.)
„ Childhood, Boyhood, Youth.
signature and date 1. 26)
„ Resurrection. VOL. I & II.
(signature and date 1.26.)
„ What Is To Be Done ? Life.
(signature and date 1.26.)
Tolstoy's work—The Cossaks ; Sevastopol ; The Invadors and Other Stories.
(signature and date 1.26.)
Wragge, Clement L.—The Romance Of The South Seas : London, 1906.

রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও জীবনী

* Blatchford, Robert—Merrie England : London, 1895.
* Bonomi, Ivanoc (Ex. Prime Minister of Italy)—From Socialism To Fascism (a study of contemporary Italy) ; Translated by John Murray ; London : 1924.
(signature and date 9. 7. 25.)

Brockway, A. Fenner—Non-Co-Operation In Other Lands : Madras.
(signature and date 14.2.22.)
Carrere, Jean—Degeneration In The Great French Masters (translated by Joseph MCabe) : London.

Das, Rajanikanta—Factory Labour in India : Berlin.

Douglas, Sir Robert K.—China : London.
(signature and date 6.7.25.)

Keynes, John Maynard—A Tract On Monetary Reform : London, 1923.
(signature and date 20. 3. 24.)

Macswiney, Terence—Principles Of Freedom : London, 1921.

Madelin, Louis—The French Revolution (translated from French) : London.
(signature and date 9.7.25.)

* Marcu, Valeriu—Lenin (translated by E. W. Dickes) : London, 1928.
(signature and date 27.7.28.)

* Marx, Karl—The Civil War In France—with a historical introduction by R. W. Postgate. (Preceded by the two Manifestoes of the General Council of the International on the Franco-Russian War) : London, 1921.

Mitra, H. N.—India In 1918—a chronological Record of the phases of developments in Indian Polity during 1918.

—Punjub Unrest Before And After. (1921)

* Morrison, Sir Theodor—The Economic Transition in India : London, 1916.
(signature and date 5.21.)

Nag, Hem Chandra—Lawless Laws or, Regulation III & Bengal Ordinance.

* Por, Odon—Fascism (translated by E. Townshend) : London, 1923.
(signature and date 9. 7. 25.)

* Postgate, R. W.—The Bolshevik Theory : London, 1920.
(পুস্তনীতে শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষরের বদলে লেখা আছে : N. C. Uumdra, 23 Wellington St. Calcutta)

* RanSome, Williams Robins—Lenin—The Man And His Work : London, 1919. (signature and date 1923.)
Rao, M. Ramachandra—The Development Of Indian Polity.
(signature and date 28. 4. 23.)
* Seely, J.R.—Expansion Of England : London, 1918. (signature and date 16. 12. 22.)
Skelton, O. D.—Socialism : New York, 1911.
Trotsky—Lenin : London, 1925.
(signature and date 12. 25.)
* Webster, Nesta H.—Secret Societies And Subversive Movements : London, 1924.
(signature and date 12. 25.)

বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তক

* Berl Emmanuel—The Nature Of Love (authorised translation by Fred Rothwell) : London, 1924.
(signature and date 7. 7. 24.)
Bhandarkar, D. R.—Asoke : Calcutta, 1925.
Chanda, Ramaprasad—The Indo-Aryan Races, Part I—a study of the origin of Indo-Aryan people and institutions : Varendra Research Society, Rajshahi, 1916.
* Fick, Richard—The Social Organisation In North-East India In Buddha's Time : Calcutta, 1920.
Frink, H.W.—Morbid Fears and Compulsions—Their Psychology And Psychoanalytic Treatment : London,1918.
Haeckel, Ernst—The Wonders Of Life—a popular study of Biological Philosophy.
(signature and date 2. 4. 10.)
—The Riddle Of The Universe—at the close of the Nineteenth Century.
(signature and date 7. 5. 10 ; নীল পেন্সিলে বইয়ের এক কোণে লেখা আছে : 'While living who was goog His

Magestey the King Edward VII departed this life this 7th day of May in the year 1910 of Lord Jesus Christ, may his soul find···eternal rest in god. sd/S.C.2/5',

—The Evolution of Man—A Popular Scientific Study.
(signature and date 30. 7. 10.)

* Hall, Stephen King—Western Civilization And The Far East : London.
(signature and date 16. 2. 25.)

* Hunter, W. W—Annals Of Rural Bengal.
(signature and date 18. 2. 26.)

Huxley, Thomas Henry—Ethical and Political : London, 1903. (signature and date—Rangoon, 19. 3. 12.)

—Lectures and Essays, London : 1910.
(signature and date, Rangoon, 19. 3. 12.)

—Man's Place In Nature and A Supplementary Essay : London, 1908.
(signature and date 6. 12. 09.)

* Keynes, John Maynard—The Economic Consequences Of The Peace : London, 1920.
(signature and date 5. 21.)

Kroptkin, P—Russian Literature—Ideals and Realities.
(signature and date 1924.)

* —The Russian Literature : London, 1919.

Marchant, Sir James—The Control Of Parenthood : London.
(signature and date 18. 8. 23.)

Mccabe, Joseph—Haeckel's Critics Answered.
(signature and date—Rangoon, 21. 6. 10.)

Mercier, Charles—Crime & Criminals Being The Jurisprudence Of Crime—Medical, Biological & Psychological : London, 1918.
(signature and date 27. 4. 23.)

Mohindra, K. C.—India Currency & Exchange: Madras, 1922.

(Signature and date 26. 12. 62 ; প্রথম পাতায় লেখা আছে "শ্রীনির্মল")

—Money, Banking and Exchange in India.

(signature and date 28. 4. 23.)

Russel, Bertrand—An Outline Of Philosophy : London.
(signature and date 10. 5. 28.)

Seth, James—A Study Of Ethical Principles : London, 1897. (পুস্তনীতে নাম সই করা আছে : Charu Ch. Basu)

Spencer, Herbert—Principles Of Ethics—a system of synthetic philosophy, Vol.1. : London, 1904.

Sate, George—The Koran : London.
(signature and date 8. 7. 11.)

Stephen, Henry—Elements Of Analytical Psychology : Calcutta, 1907.
(প্রথম পাতায় স্বাক্ষর আছে : Rama P. Mukherjee)

Williams, L. F. Rushbrook—India In 1923-24—a statement prepa red for presentation to Parliament in accordance with the requirements of the 26th. Section of the Govt. of India Act ; Govt. of India, 1924.
(signature and date, January' 25.)

Woman : In All Ages And In All Countries series :
—Larus, John Rouse : Woman Of America.
—Thieme, Hugo. P. : Woman Of Modern France.
—Brittain, Rev. Alfred : Roman Women.
—Schoeufeld, Hermann : Woman Of The Teutonic Nations.
—Carrol, Mitchell : Greek Women.
—Butler, Pierce : Women Of Mediaeval France.
—Brittain, Rev. Alfred & Carroll, Mitchell : Women Of Early Christianity.
(The Rittenhouse Press, Philadelphia.)

* Origin Of Species : London.
    (signature and date—Rangoon, 27. 7.10. বাংলায় লেখা আছে : শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী ।)

অন্যান্য বিবিধ

Dem, Ditcher—Bengalische Erzahlor—Der Sieg Det Seela, (Pub : Ausdemindischen in Dentsche.)

Criminal Procedure Code, 1924. (Pub : M. C. Sarker & Sons, Calcutta, 1924.)

Pocket Criminal Hand Book (Pub : M. C. Sarker & Sons, Calcutta, 1925)

Beeton's Medical Dictionary : London.

Marten, J. T.—Census of India—India, Vol.1,1921 (Govt. of India, 1921)
    Signature and date April, 1924)

Nelson's Encyclopaedia. Vol. IV : London.
    (Signature and date 26. 7. 1911)

Thompson. W. H.—Census of India,—Bengal, Vol. V, 1921. (Govt. of India. 1921.)

পত্র-পত্রিকা

The Indian Annual Register (being an annual chronical and digest of Public affairs of India in matters—political, educational, economic etc, : Edited by H. N. Mitra, M. A. B L. 4 Vols. (From 1920-1923)
    (১৯২০ সালের খণ্ডটির পুস্তনীতে পেন্সিলে স্বাক্ষর ও তারিখ আছে ২৬।৬।২১ এবং ১৯২১ ও ১৯২২ সালের খণ্ড দু'টিতে যথাক্রমে লাল-পেন্সিল ও কালিতে শুধুমাত্র স্বাক্ষর আছে—S. C. Chatterjee.)

The Indian Quarterly Register-Being a quarterly Journal of Indian Public affairs, in matters of political, social and economic etc. : Editor : Nripendra Nath Mitra. 8 Vols. (From 1924 to 1933.)

(১৯২৪ ও ১৯২৭ সালের খণ্ড দু'টিতে পুস্তনীর ওপর শরৎচন্দ্রের পেন্সিলে স্বাক্ষর ও তারিখ আছে যথাক্রমে, S. C. Chatterjee, 20.6.25 এবং 21.9. 28.)

The Round Table (Quarterly Review of the Politics of the British Empire.)

The Socialist (A magazine of International Socialism.) Edited by S. A. Dange : Bombay. Vol. 1, No 2, 1923.

Young India (Weekly) Edited by M. K. Gandhi. Vol. III, 1921 ; Vol. IV, 1922.

(১৯২১ সালের খণ্ডটির পুস্তনীতে ১৮৭, ৩০৯, ও ৪১৮ পৃষ্ঠার উল্লেখ আছে এবং ইংরেজিতে শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষর আছে।)

বঙ্গবাণী—ভাদ্র-মাঘ : ১৩২৯ এবং ভাদ্র-মাঘ : ১৩৩০ (এই 'বঙ্গবাণী'তেই 'মহেশ' ও 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়েছিল।)

ভারতবর্ষ—পৌষ : ১৩২৫-জ্যৈষ্ঠ : ১৩২৬, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ : ১৩২৬, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ : ১৩২৭, পৌষ : ১৩২৭—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

(আষাঢ়-অগ্রহায়ণ : ১৩২৬ : সালের খণ্ডটিতে শরৎচন্দ্রের বাংলায় স্বাক্ষর ও তারিখ দেওয়া আছে : ২রা পৌষ, ১৩২৬)

গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটক (বাংলা)

আলী সেখ মোহাম্মদ—মর্মবীণা (কবিতার বই) : দারিস ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯২৫।

(প্রথম কবিতার উপরে এই কথা লেখা আছে : 'বঙ্গের গৌরবরত্ন, সুধীসমাজের শিরভূষণ, ঔপন্যাসিক কুলগুরু, সাহিত্যসম্রাট পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্তবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সু-কর-কমলে ভক্তি উপহার সরূপ প্রদত্ত হইল।—দীন গ্রন্থকার ২৮।২।২৫।')

উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (স্মরণিকা) : ২য় অধিবেশন, প্রয়াগ।

কালিদাস-এর গ্রন্থাবলী—রঘুবংশম্ (কলিকাতা, ১৩২৫)।

খাঁ, মোহাম্মদ আকরম—কোর আন শরীফ (১ম খণ্ড) : মোহাম্মদী পাবলিশিং কোং, কলিকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র—'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী' (২য় খণ্ড) : (বসুমতী কার্যালয়।)

চৌধুরী, প্রমথ—নানাকথা (প্রকাশক : প্রমথ চৌধুরী, কলিকাতা)।

প্রথম পাতার উপর লেখা আছে :

'শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করকমলেষু—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী ৪।৬।১৯'

চৌধুরী, প্রমথ—চার-ইয়ারী কথা

উপহার পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

'*To*

Srijut Sarat Chandra Chatterjee with the author's compliments.

20.9.16.'

ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী (শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৪)।

পরশুরাম—কজ্জলী (এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা)। পুস্তনীতে লেখা আছে, "শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—লেখক"।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র—চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী, ১ম ভাগ : কলিকাতা : ১৯২৫ প্রথম পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের লেখা 'চারুর দেওয়া' এবং ইংরেজিতে স্বাক্ষর ও তারিখ ২২.১০. ২৫)

—ঐ দ্বিতীয় ভাগ : কলিকাতা, ১৯২৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস—ময়ূখ (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৩) উপহার পৃষ্ঠায় সবুজ কালিতে লেখা আছে :

'পরম পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদেষু,

···চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে

শ্রীমহারাখাল।'

(প্রকাশ থাকে যে, সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত রাখালদাসবাবুর সমস্ত পাণ্ডুলিপি সবুজ কালিতে লেখা।)

বেদব্যাস—মহাভারত : কাশীখণ্ড (অনুবাদ ৺নিবারণচন্দ্র দাস) কাশী, ১৩২২।
মনুসংহিতা—(মলাটের উপরে বাংলায় স্বাক্ষর ও তাং ১. ৩. ১৩)
মুকুন্দরাম—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথমভাগ) অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বসু সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪)।
(প্রথম পাতায় শরৎচন্দ্রের ইংরেজিতে স্বাক্ষর ও তারিখ আছে, ২২.১০.২৫. এবং একস্থানে শরৎচন্দ্রের হস্তাক্ষরে লেখা আছে 'চারুর দেওয়া)'
মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন—রূপের বালাই (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৩)
(পেন্সিলে ইংরেজীতে সই ও তারিখ ২৭.৩. ১৭)
মল্লিক, রমণী মোহন—চণ্ডীদাস (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩১২)
রায় চৌধুরী, বিভাস—অভিশাপ (দি বুক ষ্টল, কলিকাতা)
রায়, দিলীপকুমার—বহুবল্লভ, স্বপ্নভঙ্গ, দুধারা (অরবিন্দ আশ্রম)। উপহার পৃষ্ঠায় লেখা আছে : 'এই বইখানি অশেষ শ্রদ্ধাপ্রেমাস্পদ শরৎদাকে উপহার দিলাম।

ইতি স্নেহধন্য মণ্টু

তারিখ ৮।৭।৩৬'

রায়, যোগেশচন্দ্র—বাংলা ভাষা (২য় ভাগ)
বাংলা শব্দকোষ (১ম খণ্ড) :
প্রথম পাতায় স্বাক্ষর : শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৯১৮'।
শর্মা, সোমেশচন্দ্র—বৈদিক সন্ধ্যা : ১মখণ্ড (বৈদিকা)।
—বৈদিক সন্ধ্যা : ২য়খণ্ড (ক্রিয়াংশ), ১৩৩৭।
সিদ্দিকী, মৌলভী চৌধুরী কাজেমদ্দিন্ আহমদ্—শান্তি সোপান বা পান্থপ্রদীপ।
(শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষর ও তারিখ আছে ২৪.৩.১৯৩৩)
হোসেন, কাজী মোতাহার—সঞ্চরণ : ঢাকা, ১৯৩৭।

শরৎ সাহিত্যের হিন্দী অনুবাদ।

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র—মজলী দিদি (অনুবাদক : রূপনারায়ণ পাণ্ডেয) : ইণ্ডিয়ন প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ।
—নববিধান „

চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র :

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ।

—পণ্ডিতজী „

—বড়ীদিদি „

— পরিণীতা „

অন্যান্য হিন্দী পুস্তক

গিবন্স, এডোয়ার্ড এডমণ্ডস্—বর্তমান এশিয়া ('দি নিউ ম্যাপ অফ এশিয়া'র হিন্দী অনুবাদ : অনুবাদক শ্রীরামচন্দ্র বর্মা), প্রকাশক : হিন্দীগ্রন্থ রত্নাকর কার্যালয়, বোম্বাই।

প্রেমচন্দ্র—প্রেম পূর্ণিমা (হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা)

ষ্টোয়ী, হ্যারিয়েট এলিজাবেথ—টাম কাকা কী কুঠিয়া, অর্থাৎ গুলামী পর কুঠার (অনুবাদ : বাবু মহাবীরপ্রসাদ পোদ্দার), প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রযাগ।

(খ)

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা :

(১) শরৎচন্দ্রের মুসাবিদা করা দরখাস্তের নকল

To

The T. Superintendent, C. S. N. Coy. Calcutta.

Sir,

Your letter No T4634 dt 27th. July 1332 along with the stamped agreement form has been received.

I beg to state that before I can sign and forward the same to your office, I shall be very much obliged if you will kindly enlighten me on the following points.

1) If it is proposed to reduce the present remuneration of Rs. 10/-to Rs. 5/-only as has been put in the agreement sent me.

2) If there is an accident which in my long experience mostly happen through negligence, mishandling and sometimes callous disregard of common sense and ordinary

marine rules on the part of the Serang and crew of the Steamers, and I am involved in a law suit who will pay for the defence? I or the company? I hope you are not asking me to shoulder this responsibility for a mere pittance.

3) In case of accident who will decide whether the company's servants or the boatmen of the landing contractor are guilty? What will be the procedure?

4) If due to any unfortunate circumstances the landing boat fail to reach the steamer you propose to hold me responsible and inflict fines or some such thing in the shape of punishment?

It is a new innovation and I am afraid of troubles.

An early reply will be very much appreciated.

Yours faithfully,
Panchkari Mukherjee.[১]

(২) 'আত্মশক্তি' সম্পাদকের নিকট প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত আত্মশক্তি সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

বাঙ্‌লার যুব সমিতির বিগত অধিবেশনে পঠিত আমার অভিভাষণটির সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং এই লেখাটি আপনার আত্মশক্তি কাগজে ছাপাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

স্বাভাবিক আলস্যবশতঃ অভিভাষণটি লেখা হইয়াছিল শেষ দিনে। নিজে ছাপাইয়া সঙ্গে লইবার সময় পাই নাই। লেখায় কাটা কুটি ছিল বিস্তর।

অতএব ১ম বর্ষ ১৮-সংখ্যার স্বাধীনতা কাগজে অভিভাষণটি পরে যখন মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল, তখন ছাপার ভুল'ও রহিয়া গেল বিস্তর। কয়েকটা স্থলে অর্থ বুঝিতে বিঘ্ন ঘটে, কোথাও বা উল্টো মানে হইয়া গিয়াছে। যেমন এক জায়গায় লেখা ছিল "স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়"

১ শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস) রক্ষিত।

সেখানে ছাপা হইয়াছে—"স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা।" 'নয়' কথাটি উঠিয়া গেছে। বিপ্লব বস্তুটিকে নিজে ভয় করি বলিয়া ইহার উল্লেখ করিতেছি না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অর্থসঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম।

আর এক স্থানে লেখা ছিল, "সহসা একদিন এলো মহাত্মার অদ্রোহ-অসহযোগ এবং তার টিকি বাঁধা রইলো খদ্দর ও চরকার দড়িতে।" দুর্ভাগ্য-বশতঃ মুদ্রিত অভিভাষণে "রইলো" শব্দটি ছাপা হয় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাহারও বুঝিতে ক্লেশ হয় না যে এই 'টিকিটি' "অদ্রোহ অসহযোগেরই"—মহাত্মার নয়।[১]

(৩) একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা

দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াস Narrow Nationalismও নয়; Chauvinismও নয়; বিশ্বমানবের হিতের জন্যই নিজের দেশ। যে দেশে জন্মেছি মানুষ হয়েছি সে দেশকে পর অধীনতার নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্ত কোরব।

আদর্শের উল্লেখ যখন কোরব তখনই বৃহৎ আদর্শ, কল্যাণের আদর্শ, গৌরবের আদর্শের কথাই স্মরণ কোরব। কেবল মহামানবতার আদর্শ গ্রহণ কর, তাকে ভারতের আদর্শ, এসিয়ার আদর্শ; হিন্দুর আদর্শ—এদিক দিয়ে কিছুতেই বিচার কোরবনা। কারণ সেই তো ক্ষুদ্র মনের সঙ্কীর্ণ হীন আদর্শ; কোনমতেই সর্ব্বজনীন মুক্ত আদর্শ নয়।

ত্যাগ কিসের? ভোগ করবে কে? কিসের জন্য জীবনের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ব্রতী হব? যারা বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সামান্য বিশিষ্ট স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবে না—শুধু তাদের জন্য? এ যেমন আত্মবিড়ম্বিত কৃপণের ধন সঞ্চয়ের মত, আমি না খেয়ে না পরে না দিযে খেটে খেটে মরি আমার নন্দদুলাল ছেলেটা যেন সমস্ত নিষ্ফল জীবনটা নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকতে পারে—এরই জন্য?

হে ভারত তুমি কি কি শিখিয়েছ না, ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে।

১ শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস) রক্ষিত

তাই ভারতের আজ এতবড় দুর্দ্দশা। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ঈশ্বর বিশ্বাসী জগতে কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। এই পরম ভাগবত কবির সহস্র political যুক্তি তর্ক ভগবানের রুদ্ধদ্বারে এসে আছাড় খেয়ে পড়ে। তাঁর একান্ত বিশ্বাস বিধাতার কল্যাণ হস্তই সব কি্ ্রে চলেছে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা কি তা আমরা জানিনে, তাঁর ইচ্ছার দোহাই politics এ আসা কোন কারণেই আমার ভালো মনে হয় না।

প্রাচীন কালের দর্শনের বড় বড় যুক্তি তর্ক যেমন বেদের বাণীর দরজায় এসে নিজেদের পথ হারিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোতো।

বড় বড় ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্তের দলই এযাবৎ দেশের politics নিয়ে নাড়া চাড়া করচে। যাদের হওয়া উচিত ছিল সন্ন্যাসী তারা হলেন politician। তাই ভারত politics (এ) এত বড় দুর্গত।[১]

(৪) 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের পরিত্যক্ত অংশ-বিশেষ

'মুখুয্যে মশাই, আমি সঙ্গে যাবো।

বিপ্রদাস সবিস্ময়ে কহিল, কোথায়? বলরামপুরে?

বন্দনা বলিল, নিয়ে যান্‌তো রাজি আছি। কিন্তু এখন সে যাওয়ার কথা বল্‌চিনে, বলচি দক্ষিণেশ্বরে যাবার। সাধুজিকে দেখবার ভারি ইচ্ছে হচ্চে,—আর যদি আপত্তি না করেন তো মা-কালীকেও দর্শন করে আস্‌বো।

কিন্তু তুমি তো এ সব বিশ্বাস করোনা।

না, করিনে, কিন্তু তাই বলে দেখ্‌বার ইচ্ছে হবেনা কেন? সংসারে সবাই কি সব বিশ্বাস করে, তা'বলে কি তারা চোখ বুজে থাকে?

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, তবে চলো। কিন্তু এঁরা ফিরে এলে তাঁদের দেখবে কে? তুমি আমি দুজনেই চলে গেলে তো ঠিক হবে না।

বন্দনা বলিল, ঠিক হবে মুখুয্যে মশাই, কোন চিন্তা নেই। অন্নদাকে বলে সমস্ত বন্দোবস্ত করে আমি এখুনি আস্‌চি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরে উভয়ে গাড়ীতে বসিয়া বন্দনা বলিল, আমি শুনেচি

১ শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস) রক্ষিত।

আপনি ভারি পণ্ডিত। এদেশ ওদেশ দুদেশের সমস্ত বিদ্যেই আপনার আয়ত্ত। অতবড় লাইব্রেরির প্রত্যেক বইটি আপনার মুখস্ত।

এ সংবাদ দিলে কে? দিদি?

না, আপনার ছোট ভাই দ্বিজুবাবু।

এটা ওর একটা বাতিক। না বলে বোধ হয় স্বস্তি পায় না।

বন্দনা এ লইয়া তর্ক করিল না। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, মুখুয্যে মশাই, সাধু-সন্ন্যাসী আপনি বিশ্বাস করেন?

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, বিশ্বাস না করবার হেতুটা কি? ওরা যে সংসারে রয়েছে এতো সর্ব্বদাই চোখে পড়ে।

বন্দনা বলিল, সে আমারও পড়ে। আমি মানুষগুলোর কথা বলিনি, জিজ্ঞেসা করচি ওরা যা' বলে তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

ওরা কি বলে?

কি বলে তার আমি কি জানি? আমি কি তাদের জিজ্ঞেসা করেচি না কি?

বন্দনা মনে মনে বুঝিল প্রশ্নটা বোকার মত হইয়া গেছে। একটু মৌন থাকিয়া কহিল, সেই কথাই তো জানতে চাইচি, 'আপনিই বলুননা ওরা কি বলে। বলুন না, 'কিসের জন্যে ওদের দেখতে যাচ্ছেন।[১]

(৫) শরৎচন্দ্রের নির্বাচনী আবেদন :

হাওড়ায় মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন

শ্রীযুত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদন

হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া গতবার আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। আমি যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কমিশনারগণ একবাক্যে তাহাতে সম্মত হওয়ায় আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আগামী মার্চ মাসে আবার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ নির্ব্বাচন

১ শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস) রক্ষিত।

হইবে। হাওড়ার কংগ্রেস কর্ম্মীরা আমার উপর প্রার্থী নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়াছেন। নির্ব্বাচন লইয়া অন্য সকল স্থানে যে দলাদলি ও বিবাদ হয় তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের সদিচ্ছা থাকাতেই হাওড়াবাসিগণ এই কার্য্য করিয়াছেন—সে জন্য আমি তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। হাওড়ার লোক যে সাধারণ বিবাদ চাহেন না, তাহা জানিয়াই আমি এই দায়িত্বপূর্ণ ভার লইতে সম্মত হইয়াছি তবে মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটি যাহাতে আরও একবার কার্য্য করিবার সুযোগ পান, তাহার ব্যবস্থা করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করিবে না। শুধু ৭নং ওয়ার্ডে আমাকে সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—সেখানে একজন কমিশনার কংগ্রেস দল ত্যাগ করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে আমি হাওড়া করদাতাদিগকে এক আবেদন জানাইতেছি—যাঁহারা কংগ্রেসের লোক নহেন, তাঁহারা যেন সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন। আমাদের সম্মুখে যে সংগ্রাম পড়িয়া আছে, তাহা সম্পাদন করিতে হইলে অন্য কোন দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া চলিবে না। দেশের বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচারণ করা কাহারও পক্ষেই শোভন নহে। আশা করি আমার নিবেদন ব্যর্থ হইবে না এবং হাওড়ার অধিবাসীরা আমার এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।

কংগ্রেসের পক্ষে আমি নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে প্রার্থী স্থির করিয়াছি—

১নং ওয়ার্ড
শ্রীযোগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতিলাল বর্ম্মণ

২নং ওয়ার্ড
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ

৩নং ওয়ার্ড
শ্রীখগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
শ্রীপঙ্কজ কুমার ঘোষ

শ্রীবিজয় কুমার মুখোপাধ্যায়
(স্বতন্ত্র)
কংগ্রেস দলের সমর্থিত

৪নং ওয়ার্ড
পরে নাম প্রকাশ করা হইবে।

৫নং ওয়ার্ড
শ্রীবরদা প্রসন্ন পাইন
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মিত্র

৬নং ওয়ার্ড
শ্রীগৌরমোহন রায়
শ্রীবিজয় কৃষ্ণ হাজরা

৭নং ওয়ার্ড
শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দত্ত
শ্রীকার্তিক চন্দ্র দত্ত

৮নং ওয়ার্ড
শ্রীভোলানাথ রায়
শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য
ডাক্তার বেণীচন্দ্র দত্ত

৯নং ওয়ার্ড
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়

১০নং ওয়ার্ড
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

স্বাঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটি।[১]

(গ)

শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য

(১) আলীপুর জেলে বন্দীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় নিবন্ধ :

দরদী শরৎচন্দ্র

কলিকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে এবং বাঙ্গলার আরও কয়েকটি জেলে বহু বিশিষ্ট দেশসেবক আজ অনশনে। যাঁহারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনায় শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে সুকঠোর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন—শ্রান্তি মানেন নাই, গৃহের আরাম চান নাই, আপনাদের সর্ববিধ সুখের আশা যাঁহারা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছেন, তাঁহারা আজ অনশনে। অপরাধ তাঁহাদের যত গুরুই হোক্, এ সংবাদে আজ বাঙ্গলার চিত্ত-সমুদ্রে ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র স্বয়ং আলিপুর জেলে গিয়া ইহাদের প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিয়া

১ 'বঙ্গবাণী' দৈনিক পত্রিকা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১।

বসিয়াছেন। প্রথমদিন নাকি তিনি জেলে প্রায়োপবেশনকারী নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পান নাই। পরে গত শনিবার সে অনুমতি দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক, তিনি মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার স্বপ্নে বিভোর। তিনি স্রষ্টা, তিনি রূপধ্যেয়ানী। কিন্তু এ দুঃসংবাদে তাঁরও ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে নিভৃত পল্লীনিবাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেও কলিকাতায় ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কুসুমগুলি আজ বিপন্ন। তাঁহাদের বাঁচাইতে হইবে—শরৎচন্দ্রের জেলে ছুটিয়া যাওয়ায় সে আকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

গত ১৯২১ সালে যখন এ দেশে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। সমগ্র দেশ সেদিন আশা করিয়াছিল সেদিনের আকাশে যে স্বরটি ধ্বনিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের বীণায় তাহা অপরূপ ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ যখন সময়ে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু নবযৌবনমত্ত মানুষের গান তাঁহার বীণায় বাজিল না। বলাকার কবি তখন ভারতকে ছাপাইয়া সমগ্র বিশ্বে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন, তিনি বলিলেন-সব ঝুটা-সব ঝুটা। রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল না, কিন্তু সে সময়েই আশাহত দেশ শরৎচন্দ্রকে পাইয়া বাঁচিয়া গেল। রণকুয়াসাচ্ছন্ন ভারতের নবজাগ্রত যৌবনকে স্মরণ করিয়া তিনি শোনাইলেন পথের দাবীর কথা। এতদিন আপনার খেয়ালে পথের দুপাশের যে-ফুল তুলিয়া তিনি সাজি ভরিয়াছিলেন, বাণীর দেউলে তা চিরদিন অম্লান থাকিবে। তাতে আছে স্নিগ্ধতা, আছে যাদু, আছে ব্যথিত মানুষের গোপন হিয়ার অতি সুনিবিড় মায়া। তাতে আছে, যে যৌবন সৃষ্টি করে, যে আপনার আনন্দে মধুচক্র রচনা করে তারই সুগোপন ব্যথা, কিন্তু যৌবন তো শুধু সৃষ্টি করে না ; যৌবন ভাঙ্গেও, অত্যন্ত নির্মম হইয়া ভাঙ্গে। পরবর্তী উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিল সেই ভাঙ্গার গান।

শরৎচন্দ্র দরদী শিল্পী। মাতৃভূমির সমস্ত ব্যথা ও দৈন্য তাঁহার লেখনীতে তাই অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠে। জাতির জীবনে যত কিছু দৈন্য, যাহা কিছু লজ্জাকর তাহা তাঁহার মনকে স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার লেখায় তাঁহার সেই কোমল মনের পরিচয় পাই। নিজের জীবনে একদিন তিনি বহুরূপে বহু দুঃখই পাইয়াছেন, নিজের দুঃখের ভিতর দিয়া চিরজীবন তিনি মানবতার দুঃখের সন্ধান করিয়াছেন। তাই মানবতার দুঃখ তিনি এমন আপন করিয়া দেখিতে

পারিয়াছেন যে দরদ তাঁহার লেখায় ফোটে, অনশনক্লিষ্ট বন্দীদের দেখিতে যাওয়াতে সেই দরদের পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।[১]

(২) অনিলাদেবীর কাছে নরেন্দ্রদেবের পত্র

Phone :—B.B. 4099

পাঠশালা
ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীনরেন্দ্র দেব
সহ-সম্পাদক—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
৩০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
১০ শ্রাবণ ১৩৪৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দিদি, আমি শরৎদার একখানি ক্ষুদ্র জীবনী লিখেছিলেম—প্রকাশের হাতে একখানি বই আপনার জন্য পাঠিয়েছিলেম, আশা করি পেয়েছেন। বইখানি ফুরিয়ে গেছে; আবার ছাপচি। আর কেউ কোনও জীবনী বার করলেনা দেখে আমি এবার শরৎদার জীবনীটি বড় করে এবং যতটা সম্ভব সুসম্পূর্ণ করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি। আপনার সাহায্য ছাড়া তা হওয়া সম্ভব নয়।

শরৎদার ছেলেবেলার যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা আপনার মনে আছে দয়া করে আমাকে লিখে জানালে বিশেষ উপকৃত হব। তাঁর কোন চিঠিপত্র যদি আপনার কাছে থাকে তাও পাঠাবেন। অবশ্য সেগুলি নকলকরে নিয়ে আপনাকে আবার ফেরৎ পাঠাবো। শরৎদার অনেকগুলি চিঠি সংগ্রহ করেছি।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসবার পর শিবপুর, সামতাবেড় বাসকালীন তাঁর জীবনের যে যে উল্লেখযোগ্য কাহিনী আপনার মনে পড়ে জানাবেন।

আপনাদের ছোটমামা বিপ্রদাস গাঙ্গুলী মহাশয়কে পত্র লিখেছিলেম। তিনি তার উত্তরে যে সকল কথা জানিয়েছেন প্রকাশ ভায়ার কথার সঙ্গে তা মিলছেনা। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানান বড়ই বাধিত হব। কারণ আপনি তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় বড় বোন, আপনার কথাই সবচেয়ে বেশী প্রামাণ্য। কথাগুলি এই :—

১। আপনার মায়ের নাম 'ভুবনমোহিনী' না 'ভুবনেশ্বরী' ?

১ 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা, ২৮শে জুলাই, ১৯৩০।

২। আপনারা পাঁচ ভাই-বোন—না সাত ভাই-বোন ?

৩। সুশীলা দেবীর না কি 'মনিয়া' নাম ছিল না ?

৪। সুশীলা দেবীর বিবাহ না কি বিপ্রদাস বাবু নিজে দিয়েছিলেন এবং বিবাহের সমস্ত-ব্যয়ভার নিজে বহন করেছিলেন ?

৫। শরৎদার এফ-এ পরীক্ষার ফীও নাকি বিপ্রদাসবাবু নিজে দিয়েছিলেন। ২০৲ টাকা ফী ও ৪০৲ টাকা কলেজের মাহিনা একুনে ৬০৲ টাকা তিনি একজনের কাছে মোটা সুদে ধার করে শরৎদাকে দিয়েছিলেন। শরৎদা নাকি সে টাকা জমা না দিয়ে এবং পরীক্ষা না দিয়ে সেই টাকা নিয়ে পালিয়েছিলেন।

৬। ভাগলপুরে মামার বাড়ীতে নাকি আপনাদের খুব যত্নেই রাখা হয়েছিল। কখনও কোনো কষ্ট দেওয়া হয়নি। মতিবাবুকে সপরিবারে তাঁরা প্রতিপালন করেছেন, আপনার বিবাহও তাঁরাই খরচ করে দিয়েছেন ? উপেন গাঙ্গুলী, লালমোহন গাঙ্গুলী, প্রভৃতি শরৎদার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন ? উপেনবাবু বলেন তাঁরা ওঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। রেঙ্গুনে শরৎদা নাকি উপেনবাবুর নিজের ভগ্নীপতি অঘোরবাবুর আশ্রয়েই ছিলেন ? সুরেন গাঙ্গুলী ও তাঁর পিতা শরৎদার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন ? শরৎদার জীবনী সম্বন্ধে আপনার যতদূর যা মনে পড়ে দয়া করে যদি সবিস্তারে আমাকে জানান তবেই তাঁর জীবনীটি সুসম্পূর্ণ হতে পারে। যতশীঘ্র সম্ভব জানাবেন। টিকিট আঁটা খাম পাঠালুম। আশা করি সমস্ত কুশল। আমাদের প্রণাম নিন। ইতি

আশীর্ব্বাদাকাঙ্খী—নরেন

পুঃ—সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে তরুণ বয়সে শরৎচন্দ্রের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানেন কি ? নিরুপমা দেবীকে নাকি শরৎদা ভালবেসেছিলেন এবং সেই প্রেমের ব্যর্থতাই নাকি তাঁর জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল ও তাঁকে দেশত্যাগী করেছিল ?[১]

(৩) হিরন্ময়ী দেবী কর্তৃক শরৎ জন্মজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন :

'পানিত্রাস ১৭ই সেপ্টেম্বর—অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের হাওড়া জেলার

১ শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস) রক্ষিত।

সামতাবেড় গ্রামের বাসভবনে শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পাণিত্রাস উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা ৬টায় শরৎ-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী। "পল্লীর শরৎচন্দ্র" এই পর্যায়ে বক্তৃতা করেন গ্রন্থাগারের সহকারী সম্পাদক তারাপদ সাঁতরা। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসমরকুমার ঘোষাল। ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। (যুগান্তর, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯)

(ঘ)

সামতাবেড়ে বসবাসকালীন শরৎচন্দ্রের রচনাপঞ্জী :

ষোড়শী (নাটক)—'দেনা পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪,তারিখে শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত নাট্যমন্দির লিঃ কর্তৃক প্রথম অভিনীত। নাটকটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩ই আগষ্ট, ১৯২৭।

রমা (নাটক)—'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ। প্রথম প্রকাশ : ৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৮।

তরুণের বিদ্রোহ (প্রবন্ধ সংকলন)—১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী লাইব্রেরী 'তরুণের বিদ্রোহ' নামে প্রকাশ করে। পরে দ্বিতীয় সংস্করণে নারায়ণ পত্রিকায় (ফাল্গুন চৈত্র, ১৩২৮) প্রকাশিত 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হয়ে আর্য পাবলিশিং কোম্পানী কর্তৃক ঐ সালেই প্রকাশিত হয়।

শেষ প্রশ্ন—'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৩৪ সাল থেকে ছাপা আরম্ভ এবং শেষ হয় ১৩৩৮ সালে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ২রা মে, ১৯৩১।

স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ সংকলন)—বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত যে প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সংযোজিত হয় তা হল : স্বদেশ ॥ আমার কথা, স্বরাজ সাধনায় নারী, শিক্ষার বিরোধ, স্মৃতিকথা ও অভিনন্দন। সাহিত্য ॥ ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য, গুরু-শিষ্য সংবাদ, সাহিত্য ও নীতি, সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি, ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত, আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ, সাহিত্যের রীতি ও নীতি, অভিভাষণ [১], অভিভাষণ [২], যতীন্দ্র-সংবর্ধনা, শেষ প্রশ্ন ও রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থটি ময়মনসিংহ থেকে ১৯৩২ সালে আর্য পাবলিশিং প্রকাশ করেন।

শ্রীকান্ত (চতুর্থ পর্ব)—'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩ই মার্চ, ১৯৩৩।

অনুরাধা, সতী ও পরেশ (গল্প সংকলন)—'অনুরাধা' গল্পটি 'ভারতবর্ষে' (১৩৪০, চৈত্র সংখ্যা), 'সতী' 'বঙ্গবাণী'তে (১৩৩৪, আষাঢ় সংখ্যা) এবং 'পরেশ' 'শরত্তের ফুল' (১৩৩২) নামক গল্পগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ : ১৮ই মার্চ : ১৯৩৪।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী : ৬ষ্ঠ ভাগ (বসুমতী সংকলন)—এই গ্রন্থাবলীতে, শ্রীকান্ত-৩য় পর্ব, নববিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষ্মী ও অভাগীর স্বর্গ সংকলিত হয়। বসুমতী কার্যালয় থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

বিজয়া (নাটক)—'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ। ৬ই পৌষ, ১৩৪১, তারিখে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'নবনাট্য মন্দির' কর্তৃক প্রথম অভিনীত। নাটকটির প্রকাশকাল : ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪।

বিপ্রদাস (উপন্যাস)—'বেণু' পত্রিকায় ১৩৩৬-৩৮ বঙ্গাব্দে ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বেণু' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৭ সাল থেকে ১৩৪১ সাল পর্যন্ত পুনরায় প্রথম থেকে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ : ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় এইটিই হল শেষ উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী : ৭ম ভাগ (বসুমতী সংকলন)—এই গ্রন্থাবলীতে সংযোজিত হয়েছে : শ্রীকান্ত-৪র্থ পর্ব, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মূল্য। বসুমতী কার্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশ : ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৩) পর প্রকাশিত

শরৎচন্দ্র ও ছাত্র সমাজ (ভাষণ সংকলন)—বিভিন্ন কলেজ ছাত্রদের আয়োজিত সভায় শরৎচন্দ্রের প্রদত্ত ভাষণের সংকলন। কোলকাতার 'শ্রীহর্ষ' কার্যালয় থেকে সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

ছেলেবেলার গল্প (গল্প সংকলন)—এই গ্রন্থের সাতটি গল্পের মধ্যে পাঁচটি গল্প শরৎচন্দ্রের রচনা এবং 'কলকাতার নূতন দা' ও 'দেওঘরের স্মৃতি' এই সংকলিত দুটি গল্প সংযোজিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশকাল : এপ্রিল, ১৯৩৮।

বাল্য-স্মৃতি (স্মৃতিকথা)—'১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জয়শ্রী' পত্রিকায় নিরুপমা দেবী 'পুরাতন কথার আলোচনা' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্রের কথাও কিছু কিছু ছিল। সেই কারণেই ঐ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র 'বাল্যস্মৃতি' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। কিন্তু ছাপান নি। প্রবন্ধটি তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৪৫ সালের আশ্বিন মাসে 'ছোটদের মাধুকরী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।' (দ্রঃ শরৎচন্দ্র-১ম খণ্ড : গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ২৩২)।

শুভদা (উপন্যাস)—এ উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের প্রথম দিককার রচনা। প্রথম প্রকাশকাল : ৫ই জুন ১৯৩৮।

শেষের পরিচয়—(উপন্যাস)—শরৎচন্দ্রের শেষ দিককার লেখা 'শেষের পরিচয়', 'আগামীকাল' ও 'জাগরণ'—এই তিনটি উপন্যাস, যথাক্রমে 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা' ও 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবং আকস্মিক পরলোকগমনে এই তিনটি রচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে 'শেষের পরিচয়'-এর ষোল পরিচ্ছেদ থেকে ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ রাধারাণী দেবীর লেখা : উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকাল : ৭ই জুন, ১৯৩৯।

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী (পত্র সংকলন) : সম্পাদনা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮।

শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী (রচনা সংকলন)—সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রকাশকাল, ২৩শে জুলাই ১৯৫১।

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী (পত্র সংকলন) : সম্পাদনা—গোপালচন্দ্র রায় ; প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৫৪।